‘প্রথম আলো’ : আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় জেগে ওঠার ইতিহাস সন্ধান

‘প্রথম আলো’ উপন্যাসটির প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে। দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে। প্রথম পর্বের উৎসর্গ পত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে’, এবং দ্বিতীয় পর্বের উৎসর্গ পত্রে খুব ব্যঞ্জনাবহ ভাবে লিখেছেন, ‘ভানু, রবি, রবিবাবু এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে’। অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই বুঝে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথই এই উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্দু। বাংলার এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের বিবর্তন তথা রবীন্দ্রনাথের আত্ম আবিস্কারের পথেই সময়ের স্বরূপকে খুঁজেছেন তিনি। উপন্যাসটির সঙ্গে যুক্ত করেছেন ‘লেখকের কথা’ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাঁর বহুপাঠের পরিচয়বাহী দীর্ঘ একটি ‘গ্রন্থপঞ্জি’। এই ‘লেখকের কথা’ অংশে তিনি জানিয়েছেন, “ ‘সেই সময়’ উপন্যাসের মূল উপজীব্য ছিল সমাজ সংস্কার, তাকে কেন্দ্র করে নানাবিধ দ্বন্দ্ব, বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদিকাল, শিক্ষা বিস্তার ও একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে স্থান দেয়নি। বরং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভয় পেয়েছে, তা যে এক ধরনের বিপ্লব তা বোঝেও নি, সমর্থনও করেনি। পূর্ববর্তী দীর্ঘকালের অরাজকতার বদলে ইংরেজরা যে শক্তিশালী স্থায়ী সরকার গড়েছিল, বরং তাতেই স্বস্তি পেয়েছে। কিছুটা মুক্ত চিন্তার অধিকারী সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী মন দিয়েছে সংস্কৃতি চর্চায়। পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যেই সেই মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লব ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস এদেশের অনেকের কাছে পৌঁছে যায়। আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে ইংরেজের মার খাওয়া

এবং জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয়ের সংবাদে এদেশেও কিছু মানুষের মনে এই চেতনা জাগে যে, ইউরোপীয় শক্তিগুলি অপরাজেয় সর্বশক্তিমান নয়। 'প্রথম আলো' উপন্যাসের সময়সীমায় জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষই প্রধান ঘটনা। তৎকালীন দেশের অবস্থা বোঝাবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলন, অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চা, থিয়েটারের ভূমিকা, কবি রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর, জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে তরুণদের মতবিরোধ, দুর্ভিক্ষ ও প্লেগরোগ, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা সৃষ্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে আনতে হয়েছে।... 'প্রথম আলো' আমার পূর্ববর্তী উপন্যাস 'সেই সময়'-এর পরবর্তী খন্ড নয়, কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায় মিল আছে।''[১] উপন্যাস নিয়ে এই বিস্তীর্ণ আলোচনা সূত্রে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন তাঁর জীবনবোধ ও জীবনদৃষ্টিকে। 'প্রথম আলো' -এর বিস্তীর্ণ পরিসরে তিনি ইতিহাসকে রেখেছেন; সেই ইতিহাসের পরিসরেই ডানা মেলেছেন কল্পনার সীমায়। সমকালকে তুলে এনেছেন নিখুঁত বাস্তবতায়। এই উপন্যাসটিরও মূল নায়ক সময়। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সময়কালে এই ঘটনা প্রবাহ বিস্তৃত।

এই সময়কালে হঠাৎ কিছু মানুষ যেন ঘুম ভেঙে আবিষ্কার করেছে দেশ নামের একটা ভাবসত্তাকে, অনুভব করেছেন পরাধীনতার গ্লানি। 'প্রথম আলো'র ১১৩৪ পৃষ্ঠার পরিধিতে ঔপন্যাসিক বিস্তার করেছেন উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিধিরও। 'সেই সময়' -এর কলকাতা কেন্দ্রিকতা এখানে নেই। এই উপন্যাসে সূচনা পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে, সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায়, তারপর সমগ্র ভারতে। মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও বিশালতা আছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসে যে সময়কে জীবন্ত করেছেন, বাংলায় তখন এসেছেন একের পর এক মহামানব। ইংরেজ অধিকৃত বাংলাদেশ তখন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে নিজ শক্তিকে। দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বাঙালীর

আত্মসচেতনতা ও সমাজসচেতনতার সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেছিল প্রবল রাজনীতি সচেতনতা। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যুগসূর্য রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে এসেছেন প্রধান বিন্দুতে। তাঁর পাশে দাঁড় করিয়েছেন বিবেকানন্দকে। এই দুই সূর্য কিরণে আলোকিত হয়েছে বাংলার আকাশ। সময়কে ফুটিয়ে তুলতে তিনি এনেছেন কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিপ্লববাদ। এই অনুষঙ্গেই এনেছেন তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তাধারা, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের ভূমিকা, কংগ্রেসের প্রবীণ-নবীন বিরোধ, দুর্ভিক্ষ-মহামারি, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ও ভারতবাসীর প্রবল বিরোধিতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। কাল্পনিক বৃত্তেও আছে ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকা ত্রিপুরা রাজ্যের চিত্র। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের পাশে উঠে এসেছে রাজার অবৈধ পুত্র ভরত। ভরত-ভূমিসুতা বৃত্ত উপন্যাসের গতিময়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, চিনিয়েছে সময়ের বিবর্তনকে। ‘প্রথম আলো’ -তে উঠে এসেছে উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত, আত্মসচেতন ও সমাজসচেতন বাঙালীর বিশ শতকের প্রথম দশকে জাতীয়তা বোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় জেগে ওঠার ইতিহাস।

উপন্যাসের ভৌগোলিক মানচিত্রের বিস্তার ঘটিয়ে এদেশে প্রথম আলো কীভাবে আলোকিত করেছিল সমকালের বোধ ও চেতনাকে তারই স্বরূপ সন্ধান করেছেন। ‘সেই সময়’ -এর পরস্পর বিরোধিতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি বাঙালী সমাজ ‘প্রথম আলো’র সময় পরিসরে এসেও। উপন্যাসের সূচনাতেই ঔপন্যাসিক পাঠককে নিয়ে গেছেন ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম স্বাধীন রাজ্য ত্রিপুরাতে। প্রথম আলোয় আলোকিত কিছু চরিত্র তুলে এনে সময়ের সন্ধান করতে চেয়েছেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যের শাসনে ত্রিপুরায় ব্রিটিশ ভারতীয় আধুনিকতা প্রবেশ করেছে। যদিও এই আধুনিকতা সরিয়ে দিতে পারেনি পুরোনো যা কিছু আছে তাঁর সমস্তটাকেই। বীরচন্দ্র মাণিক্য -এর পরিচয় দিয়ে গিয়ে ঔপন্যাসিক

জানিয়েছেন, "...মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য। ইংরেজ শাসিত ভারতের মধ্যেও তিনি এক স্বাধীন নরপতি।... মহারাজ বয়সের বিচারে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছলেও তাঁর অঙ্গসঞ্চালন যুবকোচিত। কিছুক্ষণ আগেই তিনি দীর্ঘপথ অশ্বচালনা করে রাজধানীতে ফিরেছেন। বংশের প্রথা অনুযায়ী তিনি নবমীর রাত্রিতে উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন। মহাভোজের সময় উপস্থিত থাকতে হবে বলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফিরেছেন। ...এই রাজ্যের প্রজারা সবাই আদিবাসী, বহু উপজাতিতে বিভক্ত, তাদের ভাষাও বিভিন্ন। ...রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রিয় ভাষা বাংলা, অনেকদিন ধরে এ রাজ্যের সরকারি ভাষাও বাংলা। হালে কিছু কিছু রাজকর্মচারী দু' পাতা ইংরিজি শিখে দরবারের কাজে ইংরিজি প্রচলনের চেষ্টা করেছিল, মহারাজ ধমক দিয়ে তাদের নিবৃত্ত করেছেন। ...মহারাজ ইংরেজের সংস্পর্শ থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকতে চান। অবশ্য একটি বিলিতি দ্রব্যের প্রতি মহারাজের খুব আসক্তি। ক্যামেরা!"[২] যে রাজ্যে রাজা ছবি তুলতে উৎসাহী, সেই রাজ্যে প্রজারা ছবি কথাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অর্থাৎ খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভোরের আলো পৌঁছতে পারেনি সাবঅলর্টানের জীর্ণ কুটিরে তা শুধুই আলোকিত করেছে উচ্চবিত্তের কাঁচ ঘেরা ঘরকে। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, "ছবি কাকে বলে তা এদেশের মানুষ জানবে কী করে, অনেকে যে নিজের মুখখানাই স্পষ্ট করে কখনও দেখেনি।... প্রতিদিনের আহার্য যেখানে অনিশ্চিত, শরীর ঢাকার জন্য একটুকরো বস্ত্র মাত্র সম্বল, সেই সব অরণ্য কুটিরে দর্পণের বিলাসিতার প্রশ্নই নেই। মেয়েরা মুখ দেখে স্থির জলে।"[৩] প্রথম আলোয় আলোকিত অবশ্যই রাজা স্বয়ং। প্রান্তিক মানুষ এই আলোক সীমানার সম্পূর্ণই বাইরে।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য -এর রাজ্যে বিজয়া দশমীর দিন হাসাম ভোজনের একটি দিনই সকল উপজাতিকে এক জায়গায় মেলাতে চান, সকলের মাঝখানে আহার করতে বসে বুঝিয়ে দিতে চান তার চোখে

প্রজাদের মধ্যে কোন জাতি বৈষম্য নেই। ত্রিপুরার রাজকার্যে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকতা প্রবর্তনের জন্য মহারাজ কলকাতা থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এনেছেন, শশিভূষণ সিংহ নামে এক নব্যশিক্ষিত যুবক তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি রাজকুমারদের শিক্ষক। হাসাম ভোজের সভায় উপস্থিত থেকে তিনি দলে দলে প্রজাদের আগমন প্রত্যক্ষ করছেন। রাজপুত্রদের গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত কলকাতার নব্যশিক্ষিত যুবক শশিভূষণ সিংহ সেই সমবেত জনতার মাঝে একটি সাদা চামড়ার ইউরোপীয়কে দেখে মন্তব্য করেছেন, "আশ্চর্য! আশ্চর্য! ...মহারাজ, একপাল মেষের মধ্যে একটি ব্যঘ্র শাবক দেখলে আপনি অবাক হবেন না? আমি যে তাই দেখছি।"[৪] উপন্যাস আরও কিছুদূর এগোলেই জানা যায় শশিভূষণ ইংরেজ শাসনাধীনে থাকতে না চেয়েই এই প্রান্তিক ক্ষুদ্র রাজ্যে এসেছেন, ইংরেজ জাতির প্রতি জাতক্রোধেই তিনি কলকাতা ত্যাগ করেছেন, সেই মানুষের মুখে প্রথম উচ্চারিত এই বাক্য পাঠককে হতবাক করেছে। আসলে নব্যশিক্ষিত কলকাতার যুবসমাজ বিশ শতকের প্রথম পর্বে পারেনি ঔপনিবেশিক মনোভাব থেকে মুক্ত হতে। সাদা চামড়া তার কাছে শক্তির প্রতীক। ঔপন্যাসিক এখানে দেখাতে চেয়েছেন, আমাদের আজকের এই উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে দাঁড়িয়েও ভারতীয় বিশেষত বাঙালী যে পারেনি এই বিজাতিপ্রেমের বীজকে ছাটাই করতে, তার বীজ রোপণ হয়েছিল সেই সময় থেকেই। কিংবা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেক্ষণবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ভাবা যায়, শশিভূষণের কাছে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সম্পর্ক বাঘ ও মেশ শাবকের মত খাদ্য-খাদকের। সেই অর্থেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন। মহারাজ শশিভূষণের এই কথা সমর্থন না করে বলেছেন, "সিংহমশাই, আমি আমার প্রজাদের মেষের পাল বলে মনে করি না।"[৫] শশিভূষণও নিজের উপমাকে বদলে ফেলে বলেছেন, "ফুলের বাগানে একটি বিষাক্ত সাপ।"[৬] অর্থাৎ দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নবজাগ্রত বাঙালী জাতি রাজনৈতিক চেতনায় জাগ্রত হয়েছিল। শশিভূষণের উপমা প্রমাণ করে একদিকে বাঙালী হয়েছিল ইংরেজ জাতির শক্তি ও কর্মদক্ষতা

সম্পর্কে সচেতন, আবার পরক্ষণেই সে সচেতন তাদের শাষণ ও শোষণের মনোভাব সম্পর্কে।

উপন্যাসে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য নতুন সভ্যতার আলোতে আলোকিত হয়ে জাতি বৈষম্য মানেন না, প্রজাদের ওপর অকারণ নির্যাতন করেন না, তিনি নিজে কবি ও কাব্যপ্রেমী, ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণবপদ সাহিত্যে তাঁর প্রবল অনুরাগ, বাংলা ও সংস্কৃতের নানা তথ্য তিনি শশিভূষণের কাছ থেকে জেনে নেন, ক্যামেরা সম্পর্কিত নানা তথ্যও শশিভূষণের থেকে জেনে নিতে দ্বিধা করেন না, নিজ প্রজাদের সঙ্গে একাসনে ভোজনেও দ্বিধা করেন না, আগরতলায় ভালো বইয়ের দোকান খুলতে তিনি আগ্রহী, উচ্চাঙ্গের গান বাজনা, কাব্যরস, চিত্রশিল্পেও প্রবল আগ্রহী। এই রাজাই আবার নিজের রাজ্যে সতীদাহ প্রথা রদ করতে দ্বিধান্বিত, রাজ্যে 'তিতুন প্রথা' প্রচলিত, দাস প্রথা সদ্য নিষিদ্ধ হয়েছে রাধারমণের উদ্যোগে। যদিও পঞ্চানন্দ নামে এক পার্শ্বচরের কথায় দাসীকে নগ্ন করে পাশ্চাত্য প্রথায় তার ছবি আঁকতে দ্বিধাহীন, এবং বহুনারী সঙ্গ করতেও সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন। মহাদেবী ভানুমতী রাজ্যের পাটরাণী। এই বাল্যসঙ্গিনীর সঙ্গে হৃদয় সম্পর্কে যুক্ত হয়েও নিয়মিত নতুন সুন্দরী ভোগে তিনি অত্যসক্ত। নিজ সন্তান সমরেন্দ্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার ইচ্ছায় ভানুমতীও বালিকা মনোমোহিনীকে ভেট দিয়ে মহারাজকে খুশি রাখতে চান। তার উক্তি, "সত্যি করে বলুন তো, ওকে আপনার পছন্দ হয়নি? সেই জন্যই তো ওকে আমি পাছাড়া পরে আসতে বলেছিলাম। দিব্যি মেয়ে। লক্ষী মেয়ে। আমি ওকে আপনার হাতে তুলে দেব, আপনি ওকে নিয়ে আনন্দ করুন। ওই গতরখাগী, আবাগীর বেটী রাজেশ্বরীর কাছে আপনাকে আর যেতে হবে না।"[৭] শ্যামা দাসী নগ্ন অবস্থায় মানাঘরে দীর্ঘক্ষণ কাটানোর ঘটনা সহ্য করতে না পেরে মহারাণী ভানুমতীর মৃত্যু হলেও মহারাজ তার তীব্র অভিমান বুঝতে পারেননি। তার মনে হয়েছে

যুবরাজ হিসেবে রাধাকিশোরের নাম ঘোষণা করাতেই তিনি অভিমানে আত্মঘাতিনী হয়েছেন।

দীর্ঘ মৃত্যুশোক পালনের পর তিনি কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের ‘ভগ্নহৃদয়’ -এর কয়েক লাইন শুনে নিজের মন শান্ত করেছেন। মহারাণীর শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনোমোহিনীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন কিংবা হয়ত নিজের লালসাকেই রাণীর নামে চরিতার্থ করার পথে এগিয়েছেন। এই বিবাহের জন্য নতুন মহল পেতে তাঁর দুই কন্যার জননী রাণী করেণুকাকে তার মহল ছেড়ে দিতে বলতেও দ্বিধা করেননি। রাণীকে কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গ দিয়ে ধন্য করে নির্বাসনে পাঠানোকেই নিজের আধুনিক মহানুভবতা ভেবে আত্মগরিমায় গরিমান্বিত হয়েছেন। বীরচন্দ্রের কন্যা অনঙ্গমোহিনী নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে, সে কবিতা রচনাও করে। যদিও তার কবিতা মুদ্রিত হবার অনুমতি পায় না, “কিন্তু অন্তঃপুরের এক বধূর কবিতা মুদ্রিত হলে, কেরানি, ভবঘুরে, সাধারণ পাঁচপেঁচি ধরণের লোকও পড়ে ফেলবে, এ যে অকল্পনীয় ব্যাপার। বে-আব্রু হতে বাকি থাকল কি! অনঙ্গমোহিনীর কবিতা এখানকার অতি ঘনিষ্ঠ দু’চারজনই শুধু পড়ে, তার বাবা একজন উৎসাহী সমঝদার।”[৮] ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, সময়ের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও নারী পুরুষের ভোগের সামগ্রী। নারীকে মানুষের মর্যাদা দেবার আলো আলোকিত করেনি প্রথম আলোয় আলোকিত পুরুষের মনকে।

‘প্রথম আলো’র কাল্পনিক বৃত্তে অন্যতম চরিত্র শশিভূষণ যাকে কেন্দ্র করেই ভরত-ভূমিসূতার বৃত্ত এগিয়েছে। উপন্যাসে শশিভূষণ ত্রিপুরা রাজ্যের রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক। শশিভূষণ তার পৈতৃক সম্পত্তি বা বাংলায় কোনো চাকরি নিয়ে দিন কাটানোর পরিবর্তে বেছে নিয়েছিল ত্রিপুরার স্বজন বন্ধুহীন জীবন। এই জীবন বেছে নেওয়ার পেছনেও রয়েছে ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বষের ইতিহাস। একবার মুর্শিদাবাদের কান্দি অঞ্চলে শশিভূষণের পিতার ছোটো জমিদারি ছিল, সেখানে হরিণ শিকার

করতে গিয়ে শশিভূষণ দুজন ইংরেজ শিকারীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। ইংরেজরা শশিভূষণের গুলি করা হরিণকে নিজের দাবি করে সেটি ছিনিয়ে নিয়ে শশিভূষণকে ডাকাত বলে ঘোষণা করেছিল। বহরমপুরের পুলিশ কর্তা হ্যামিল্টন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবার সময় লাথি কষিয়েছিল শশিভূষণের মুখে। অপমানিত হয়ে ফিরে এসে দাদাদের এই চরম অপমানের কথা জানালে শশিভূষণের দাদাদের থেকে শুরু করে কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই অপমানের প্রতিকার করতে পারেনি। হ্যামিল্টনের বিরুদ্ধে মামলা করেও কোনো সুরাহা হয়নি। কলকাতার কোনো কাগজওয়ালা এই ঘটনা ছাপাতে রাজি হয়নি। তার দাদারা পুলিশ সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করে টেকা যাবে না ভেবে সেই সুন্দর তালুকটিই বেঁচে দিয়েছিল। উপন্যাসে শশিভূষণের উপলব্ধি "এত কাপুরুষ, এত মেরুদণ্ডহীন যদি কোনো জাতি হয়ে যায়, সে জাত কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে?"[৯] এই উপলব্ধির আলোকেই শুরু হয়েছে প্রথম আলোর যাত্রা।

ত্রিপুরায় শশীভূষণের পাঠশালায় ছাত্র পাওয়া দুষ্কর। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, "শশিভূষণের পাঠশালাটি বড় বিচিত্র। মাস্টার ঠিক আছে, কিন্তু ছাত্রদের কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। প্রতিদিন সকালে দোকান খোলার মত তিনি একটি টেবিলে বইপত্র, দোয়াত-কলম সাজিয়ে বসে থাকেন সকালবেলা, প্রায় দিনই কোনও ছাত্র আসে না। তিনি রাজকুমারদের শিক্ষক, শুধুমাত্র রাজকুমারগণ ছাড়া অন্য কারুর এই পাঠশালায় প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু রাজকুমারদের পড়াশোনার কোন গরজ নেই, কেউ তাড়না করে তাদের পাঠায়ও না।"[১০] উপন্যাসে রাজপুত্ররা শশিভূষণের শিক্ষায় উৎসাহী না হলেও, রাজার রক্ষিতার সন্তান ভরত লেখাপড়ায় উদ্যোগী। রাজপুত্র হয়েও সে অবাঞ্ছিত, রাজপরিবারে 'কাছুয়ার ছেলে', তাই অপাঙ্‌তেয়। শশিভূষণ অবাক হয়ে ভেবেছেন, "শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তেরও তো মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়নি, মিলন হয়েছিল

গান্ধর্ব মতে। কিন্তু শকুন্তলার সন্তান ভরতকে তো কেউ জারজ বলে না। ...এই ভরতই বা রাজকুমারের স্বীকৃতি পাবে না কেন?"[১১] শশিভূষণের চেষ্টায় জারজ রাজপুত্র ভরত মহারাজের কাছ থেকে শশিভূষণের পাঠশালায় পড়ার অনুমতি পেয়ে যায়। মহারাজের অনুমতি পাওয়ার পর, মহারাজের একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষ ভরতকে ভৃত্যমহল থেকে সরিয়ে আনেন, তাকে দুই জোড়া পরিধেয় বস্ত্র ও মাসিক দশ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেন।

শশিভূষণ শুধু ভরতের জীবনেই বিরাট পরিবর্তন আনলেন তা নয়, তার মনোজগতেও তিনি নিয়ে এলেন বিরাট আলোড়ন। "হঠাৎ যেন এই পৃথিবীটা রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে তার কাছে। ...তার বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণায় প্রবল নাড়া লেগেছে। শশিভূষণ তো বই পড়ান না, আরও অনেক কথা বলেন। এই পৃথিবীর নীচে পাতাল কিংবা নরক নেই, আকাশেও কোথাও স্বর্গ নেই। স্বর্গ আর নরক আছে শুধু মানুষের মনে। মানুষই ইচ্ছে করলে নিজের মনটাকে নরক থেকে স্বর্গে রূপান্তরিত করতে পারে। ...শশিভূষণ আরও বলেছেন যে কালী, দূর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মূর্তিগুলি শুধু পুতুল। ঠাকুর দেবতা বলে কিছুই নেই। এই বিশ্বের স্রষ্টা শুধু ঈশ্বর, তিনি নিরাকার, তার বউ ছেলেমেয়ে থাকতে পারেনা।"[১২] শশিভূষণের এই শিক্ষা ভরতের ভাবনার জগৎ পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। অন্ধকারময় জীবনকে ছাড়িয়ে সে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল আলোর দিকে। সময়ের সন্ধান করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন চরিত্রগুলো সময়ের প্রতীক। আসলে ভরতের মত ভারতবাসীদের জীবন ছিল মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে অন্ধকারের অন্ধকূপে। শশিভূষণ রূপী নবজাগ্রত ইউরোপ ভাবিয়ে তুলেছিল ভারতীয়দের। নাড়িয়ে দিয়েছিল বহুযুগ লালিত সংস্কার ও বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। যদিও এই আলোর পথে যাত্রা সহজ হয়নি। পুরোনো নির্মোক সম্পূর্ণ ত্যাগ করা একদিনের কাজ নয়। নতুন ও

পুরাতনের মেলবন্ধন একদিনে হয়নি, তাঁর জন্য উনিশ শতক থেকে যাত্রা শুরু হলেও এক শতাব্দী পেরিয়েও তার সার্বিক উদ্বর্তন ঘটেনি।

উপন্যাসে ভরতের এই আলোর পথে যাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়াল মহারাজের জন্য মনোনীতা কিশোরী মনোমোহিনী। প্রকৃতির অনিবার্য আকর্ষণে কিশোরী ভরতের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকলে একদিন ভরত রাতের অন্ধকারে আততায়ীদের হাতে আটক হল, ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে তাকে ঘাতকেরা গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে এল। নির্মম ভাবে সমাপ্ত হল তার নব রাজকুমারের জীবন। আসলে আধুনিকতার পথে যাত্রাও ভারতীয় সমাজের কাছে এই রকমই নানা ঘাত প্রতিঘাত -এর মধ্য দিয়েই গেছে। নতুন ভাবনা, নতুন বোধ, নতুন জীবন দর্শনের ভূমিতে পৌঁছনোর পথও ছিল এমনই সঙ্কটপূর্ণ। শশিভূষণ ও রাধারণ মিত্র কলকাতা যাবার পথে মেঘনা নদীর তীরে এক গঞ্জে এসে থামলেন। স্থলপথের যাত্রা সমাপ্ত করে এখান থেকেই শুরু হবে নৌকাযাত্রা। নৌকা তৈরী রয়েছে, শুধুমাত্র কিছু রসদ কিনে তারা রওনা দেবেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। শশিভূষণ চুরুট কেনার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করছিলেন, এমন সময় তিনি উন্মত্তপ্রায় ভরতকে দেখতে পেলেন। যে ছেলেটিকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন পেয়েছিল তারই চেষ্টায়, সেই ছেলেটির এমন অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত, ক্রুদ্ধ ও বেদনার্ত হলেন। যদিও রাধারমণ ভরতের এই অবস্থান্তর দেখে অবাক হলেন না। তিনি ভরতকে তাদের নৌকাতে নিতেও রাজি হলেন না। শশিভূষণকে তিনি জানালেন, "ত্রিপুরার সঙ্গে ওর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। ভরত নিরুদিষ্ট হবার পর অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। এ খবর মহারাজের কানেও যায়। তিনি একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছিলেন।... কুকুরের পেটে কি আর ঘি সহ্য হয়! তখনই আমি বুঝেছিলাম, ভরতের দিন ফুরিয়েছে।"[১৩] রাধারমণ আরও জানিয়েছেন মনোমোহিনীর কারণেই ভরতের এই বিপর্যয়। "মহারাজ নিজের সন্তান হলেও যাকে

কুকুরের মত বিদায় করতে চেয়েছেন, আমরা রাজকর্মচারী হয়ে তাকে গ্রহণ করি কীভাবে?”[১৪]

নব্যশিক্ষিত যুবক শশিভূষণ ভরতকে এভাবে ত্যাগ করতে পারেননি। আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ মানবতা বোধের জাগরণ। তিনি রাধারমণ মিত্রের সঙ্গ ত্যাগ করে ভরতকে নিয়ে কলকাতা ফিরেছেন। শশিভূষণের হাত ধরে ভরতের জীবনে এসেছে এক নতুন অধ্যায়, সেই সঙ্গে উপন্যাসেও। ভারতীয় সমাজ নব্য আধুনিকতার হাত ধরে পা রেখেছে নতুন আলোর পথে। ‘প্রথম আলো’র গন্ডি ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে এসে পৌঁছেছে ভারতের নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার বুকে। যেই কলকাতা শহর উনিশ শতক ও বিশ শতকের সংযোগ স্থলে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে কেঁপেছে নিত্য নতুন ভাবনা, নিত্য নতুন বোধ, কিংবা নিত্য নতুন জীবন দর্শন নিয়ে। মেতে উঠছে নিত্য নতুন সৃষ্টিতে। জেগে উঠেছে রাজনীতি চেতনার ভূমিতে।

নবম পরিচ্ছেদে ভরতকে কেন্দ্র করে উপন্যাস প্রবেশ করেছে কলকাতা শহরে। ঔপন্যাসিকের বিবরণে সমকালীন কলকাতাও উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিক ভাবেই, “শশিভূষণদের ভবানীপুরের এই বাড়িটি দু’মহলা। একান্নবর্তী পরিবার, তার দুই দাদা জমিদারি বিক্রি করে দিয়ে পাটের ব্যবসা করেন, ইদানিং বিদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট রপ্তানি হচ্ছে বলে ব্যবসা বেশ ভালোই জমে উঠেছে। মধ্যম ভ্রাতা মণিভূষণ একজন আর্মেনিয়ানের সঙ্গে অংশীদারত্বে নৈহাটি অঞ্চলে একটি চটকল খোলারও উদ্যোগ নিয়েছেন।”[১৫] শশিভূষণের বৌদিদের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে সমকালীন অন্দরমহলের চিত্র। “দুই বৌদি অনেকদিন পরে এই খামখেয়ালি দেবরটিকে পেয়ে খাতির যত্ন করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলেন। ...দুপুরবেলা ষোড়শ ব্যঞ্জনের ভোজনপর্ব সেরে শশিভূষণ বাইরে বেরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময়ে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া কৃষ্ণভামিনী এসে দাঁড়ালেন দরজার ধারে। হাতে একটা রুপোর

রেকাবিতে দু খিলি পান। তার নিজের দুগালও পানে ঠাসা, ঠোঁট দুটি টুসটুসে লাল। ...কোনো রকম ভূমিকা না করেই তিনি বললেন, হ্যাঁ গা, তুমি কি আর বিয়ে থাওয়া করবে না? লোকের কাছে যে মুখ দেখাতে পারি না। শশিভূষণ অবাক হয়ে বললেন, সে কি গো, বউদিদিমণি, আমি বিয়ে করছি না বলে তোমরা মুখ দেখাতে পারবে না কেন? ...শোনো তোমার কোনো আপত্তি শুনছি না। আমার এক পিসতুতো বোন আছে, তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করছি, একবার দেখ, দেখলেই তোমার পছন্দ হবে, একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা! শশিভূষণ হাসলেন। আগের সন্ধ্যেবেলা একটু ফাঁকা পেয়ে মণিভূষণের স্ত্রী সুহাসিনীও তার গ্রাম সম্পর্কে কোনও এক মাসতুতো বোনের সঙ্গে শশিভূষণের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। এমনকি, এ বাড়িতে গ্রাম সম্পর্কে এক আশ্রিতা পিসি আছেন, তিনিও পাত্রী ঠিক করে ফেলেছেন তার জন্য। সুস্থ শরীর, উপার্জনশীল কোনও পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধতে না পারলে মেয়েরা স্বস্তি বোধ করে না। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রত্যেকেরই পাত্রী একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমার মতন।”[১৬] গৃহকেন্দ্রিক জীবনে মেয়েরা দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও প্রথম আলোর কিরণ পায়নি। তারা রয়ে গেছে মধ্যযুগীয় রীতিনীতিতেই। এই যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আপামর বাঙালী পরিবারে যেখানে নারী গৃহকেন্দ্রিক, ঠাকুর পরিবারকে কেন্দ্র করে সেখানে নারী জীবনের মানচিত্রের বদল শুরু হয়েছিল। প্রথম আলোর কিরণে তারা আলোকিত হতে শুরু করেছিল।

উপন্যাসে কলকাতায় ভরতকে সুস্থ করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করার পরিস্থিতিতে শশিভূষণ নিজেই ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শশিভূষণ অধিকাংশ সময়েই আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকেন, কোনও কিছুতেই সাড়া দেন না। মাঝে মাঝে তিনি সজাগ হন, দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়, পূর্ণ চেতনা ফিরে আসে। তখন তিনি অনুভব করেন, তাঁর যেন শরীর নেই, শুধু মন আছে। এই পরিস্থিতিতেই শশিভূষণের স্বপ্নে মাতৃদর্শন হল।

মায়ের স্বপ্নে বলে দেওয়া বেল পোড়ার শরবত খেয়ে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করলেন। 'সেই সময়' উপন্যাসে নবীনকুমারের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল এই মাতৃদর্শন ও মৃতা মায়ের প্রতি প্রবল আকূতি। উপন্যাসের এই মাতৃদর্শন প্রকৃতপক্ষে শিকড় সন্ধান। সময় যখন নিত্য নতুন ভাবনা, নিত্য নতুন বোধের আলোতে আলোকিত করছে নব্যশিক্ষিত সমাজকে, তখন তারা সচেতন হয়েছে নিজের শিকড়ের প্রতি।

অসুস্থ শশিভূষণ ভরতের খোঁজ নিতে সক্ষম না হওয়ায় ভরত ভোগ করেছে চরম যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আদিম ক্ষুধার কষ্ট ভরতের গড়ে তোলা নতুন সত্তাকে ভেঙে দিয়েছে। আত্মসচেতনতার পথে এগোনো ত্রিপুরার 'জারজ' রাজকুমার গরু ছাগলের খাদ্য তেঁতুল পাতা চিবিয়েছে বাধ্য হয়ে। শশিভূষণের প্রতি প্রবল অভিমানে তার বুক ভরে উঠেছে। যদিও এই যন্ত্রণা দীর্ঘদিন সহ্য করতে হয়নি ভরতকে। শশিভূষণ সুস্থ হতেই ভরতের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। ভরতকে চিনিয়েছেন কলকাতার অলিগলি, তাঁকে দীক্ষিত করেছেন নবজাগরণের মন্ত্রে। মদ্যপান না করার জন্য তাঁকে করেছেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাকে বুঝিয়েছেন ঈশ্বরের স্বরূপ, "তোকে কতবার বলেছি না মন্দিরে-মসজিদে-গির্জেয় ঈশ্বর থাকেন না। ঈশ্বরকে নিজের মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর। নিজের ভাবের ঘরে যে চুরি করে, সে মন্দির-মসজিদ-গির্জেতে গিয়ে যতই ভড়ং দেখাক, সে সব মিথ্যে!"[১৭]

উনিশ শতকের প্রখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে পাওয়া গেছে এই উপন্যাসে। সেই সময়ের প্রবল নাস্তিক ও সংস্কার বিমুখ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভাবিত করেছেন শশিভূষণকে। শশীভূষণের হাত ধরে মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে ভরত। ব্রাহ্মরা যে সময়ে দাঁড়িয়ে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে মেতেছে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সময়কে অতিক্রম করে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলতে পেরেছেন, "এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা এখানে শুধু সাকার না

নিরাকার, দ্বৈত না অদ্বৈত এই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছে। যেন সারা দেশে আর কোনো সমস্যা নেই। বিজ্ঞানের চর্চা করলে যুক্তিবোধ আসে। যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শিখলে সাকার নিরাকার ফুৎকারে উড়ে যাবে!"[১৮] তিনি আরও বলেছেন, "ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে কেশব বাবু সদলবলে বোম্বাই গিয়েছিলেন। পথে নেমেছিলেন মুঙ্গের শহরে। সেখানে আগে থেকেই ব্রাহ্মদের আখড়া আছে। ভক্তির আতিশয্যে সেখানকার ব্রাহ্মিকারা ঘটি ঘটি জল কেশববাবুর পায়ে ঢেলেছে, তারপর সেই মেয়েগুলো তাদের লম্বা চুল দিয়ে পা মুছে দিয়েছে। নর – অবতার! মূর্তিপূজার বদলে মানুষ পূজা! ...দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ ঠাকুর, তাঁর কথা বেশ শোনা যাচ্ছে ইদানীং। বিদ্যেসাগরমশাইও একদিন বলেছিলেন বটে। তিনি নাকি পরমহংস, যখন তখন মুচ্ছো যান। মৃগীরোগ আছে কিনা একদিন গিয়ে দেখে আসতে হবে। কালীঠাকুর! ওই একটা ডবকা সাঁওতাল মাগীর সামনে লোকে যে কী করে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করে, তা আমি কিছুতেই বুঝি না।"[১৯]

উনিশ শতকের প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্রলাল সরকারের মধ্যে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন জাতীয়তাবোধের জাগরণ। উপন্যাসে তাঁর উচ্চারণ, "কেশববাবু! তাঁকে কি কম চিনি? আমাদের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানেও তিনি একসময় কত কাজ করেছেন। যেমন ওঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তেমনি নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা। ইচ্ছে করলে তিনি কত বড় কাজ করতে পারতেন, তা নয়, শুধু একটা ছোটো গুষ্টির ধর্মগুরু হয়ে রইলেন। কেশববাবু আসল কাজ কী শুরু করেছিলেন জান? যদি তিনি শুধু একটি কাজ নিয়ে লেগে থাকতেন, তা হলে মহা উপকার হত এই দেশের। কেশববাবুই প্রথম বাঙালীদের ভারতীয় হতে শেখাচ্ছিলেন। এখনও একজন পাঞ্জাবি বা মাদ্রাজি ভদ্রলোক এলে লোকে বলে একজন বিদেশী এসেছে। কিন্তু পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ বিদেশ যে নয়, আমরা যে শুধু বাঙালি নই, ভারতীয়, একথা আগে কে বলেছে? কেশববাবু পত্রিকা বের করলেন, তার নাম বেঙ্গলী

মিরার নয়, ইন্ডিয়ান মিরার। বক্তৃতার সময় উনি প্রায়ই নেশান বা ন্যাশনাল শব্দ ব্যবহার করতেন। আমরা বেঙ্গলি রেস কিন্তু ইন্ডিয়ান নেশান। ... আমরা মুসলমান নই, খ্রিস্টান নই, হিন্দু নই, আমরা ভারতবাসী। এ একটা কত বড় কথা। এই বোধটা আমাদের ছিলনা বলেই তো ইংরেজ এসে আমাদের ঘাড়ে রক্ত চুষছে। আমেরিকাতেও নানা জাতের লোক আছে কিন্তু তারা সবাই আমেরিকান, সে জন্যই দেশটা ধাঁ ধাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের নেতাদের এখন এই আদর্শের প্রচারটাই প্রধান কাজ নয়?"[২০] ভরতকে তিনি বুঝিয়েছেন, "বিজ্ঞান ছাড়া গতি নেই। তোর এই দাদাটি যদি ব্রাহ্মদের দলে ভেড়াতে চায়, সটকে পালিয়ে আসবি। নিজে ভালো-মন্দ বিচার করবি, নিজেই নিজের ধর্ম তৈরী করে নিবি।"[২১] এই বোধের জাগরণই সময়কে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কয়েক যুগ পেরিয়ে।

উপন্যাসের কাল্পনিক বৃত্তে ভরতের বিপরীতে ঔপন্যাসিক এনেছেন ভূমিসূতা নামে একটি কিশোরীকে, ঘটনাচক্রে সেও ভরতের মতই শশিভূষণের বাড়িতে আশ্রিতা। অনাথা ভূমিসূতাকে পুরী থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন শশিভূষণের মেজদাদা মণিভূষণ। বাঙালী অন্দরমহলেও যদিও ভূমিসূতার মত কিশোরী সুরক্ষিত নয়, বাইরে থেকে আভিজাত্য ও সংস্কারে বাঁধনও যে কতটা মূল্যহীন তাঁর প্রমাণ ভূমিসূতা বার বার পেয়েছে। ভূমিসূতার রক্ষাকর্তা হিসেবে বেশ কয়েকবার রুখে দাঁড়িয়েছে ভরত। সেই সূত্রে এই দুই আশ্রিত অবহেলিত চরিত্র দুটি কাছাকাছি এসেছে একে অপরের। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ভরত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, ভূমিসূতার নাচ-গান-শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়ে সে তাকে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভেবেছে, ভেবেছে, "থিয়েটারের মেয়েদের অবশ্য কেউ ভালো বলে না, সমাজে তাদের স্থান নেই, কিন্তু বাড়ির ঝিদেরও কি গ্রাহ্য করে সমাজ? অভিনেত্রীরা তবু হাততালি পায়, বাড়ির ঝি সারাদিন মুখে

রক্ত তুলে পরিশ্রম করলেও কি পায় কিছু?”[২২] ভরতকে কেন্দ্র করে কলকাতার সমকালীন সময়কে সন্ধান করেছেন ঔপন্যাসিক।

ভরত কলকাতায় এসেই দেখা পেয়েছে তার কৈশোরের দেবতা বঙ্কিমচন্দ্রের। একখানি ছেঁড়া ‘বঙ্গদর্শন’ সম্বল করেই ত্রিপুরায় লেখাপড়ার জগতে যাত্রা শুরু করেছিল ভরত, ‘আনন্দমঠ’ কবিতার মত মুখস্থ বলতে পারত সে। সেই ‘আনন্দমঠ’ -এর দ্বিতীয় সংস্করণ দেখে চরম হতাশ হয়েছে ভরত, ভেবেছে, “এই উপন্যাস থেকে ইংরেজ কেটে নেড়ে কিংবা যবন বসানো হয়েছে? কেন? আমাদের আসল প্রতিপক্ষ কে, ইংরেজ নয়? মুসলমানেরাও তো এই দেশের মানুষ! তার বন্ধু ইরফান আলি, বঙ্কিমচন্দ্রের খুব ভক্ত। সেও আনন্দমঠ পড়ে উচ্ছ্বসিত। দ্বিতীয় সংস্করণ তার চোখে পড়লে সে কষ্ট পাবে না?”[২৩] এই শহরে এসেই সে নিজের সম্পর্কে ভাবতে পেরেছে, “শিশু বয়েস থেকেই যার বাপ মা থাকে না, তার কি কোনো জাত থাকে? রাস্তায় যে কাঙালিগুলো সব জাতের এঁটো-কাঁটা খুঁটে খায়, তারা হিন্দু না মুসলমান?”[২৪] এই সময়ে দাঁড়িয়ে ভরত পুরুষ হিসেবে সমাজের নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমস্ত জাতপাত ভেদাভেদ ভুলে নিজের পরিচয় দিয়েছে মানুষ হিসেবে, বলতে শিখেছে, “আমার কোনো জাত নেই, আমি শুধু একজন মানুষ।”[২৫]

অন্যদিকে ভূমিসূতাকে তার শিক্ষিত অন্তঃকরণ নিয়েই পড়ে থাকতে হয়েছে অন্দরমহলে, দাসী হিসেবে। বাঙালী অন্দরমহলের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে হাপিয়ে উঠেছে সে প্রতিদিন, কিন্তু মুক্তির পথ পায়নি। মনে মনে ভরতকে কেন্দ্র করে বানিয়ে তুলতে শুরু করে স্বপ্নের জগৎ। যদিও সেই নিষ্পাপ স্বপ্নজগৎ রক্ষাকরার অধিকারটুকুও পায়নি ভূমিসুতা। ভরতের হাত ধরে সে ব্রাহ্ম আশ্রমে যোগ দেবার আশায় পথে নেমেছে। ভরত চেয়েছে তাকে দাসীবৃত্তির নরক থেকে উদ্ধার করে একটা স্বাধীন জীবন দিতে। যদিও সেই জীবনের সন্ধান পাওয়া ভূমিসুতার ভাগ্যে ঘটেনি।

উপন্যাসে রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যও শশিভূষণের কথামতো কলকাতায় একটি নিবাস গড়ে তোলার কথা ভেবেছে। ভূমিসুতার স্থান হয়েছে সেই রাজবাড়িতে। যেখানে ভরতের প্রবেশ অসম্ভব। রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য তাকে ভোগ করার জন্য উতলা হয়েছে, রাজা বীরচন্দ্রের আগমন সংবাদে ভরতকেও ছাড়তে হয়েছে শশিভূষণের বাড়ি। রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য নারীদেহ বিলাসী পুরুষ, রূপ গুণে সমৃদ্ধ দাসী ভূমিসূতাকে দেখে তিনি তাকে নিজের করে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, শশিভূষণও আবিষ্কার করেছেন ভূমিসূতার স্বরূপ, তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে রক্ষা করতে চেয়েছেন, উপন্যাসের সময় সন্ধানের পথে নারীর সামাজিক অবস্থানকে বার বার স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক। ভূমিসূতার বঞ্চিত জীবন আসলে সেই সময়ের নারী জীবনের বঞ্চনার ইতিহাস। একদিকে যখন ভরত ভূমিসূতাকে রক্ষা করতে, নিজের করে রাখতে সক্ষম হয়নি, এই তিন পুরুষের মাঝে পড়ে ভূমিসূতাকে একাকী পথে নামতে হয়েছে।

অন্যদিকে উপন্যাসে মামাদের জমিদারিতে বড়লোক হয়ে দ্বারিকা তার শৈশবের ভালোবাসা বসন্তমঞ্জরীকে পতিতাপল্লী থেকে উদ্ধার করে রেখেছে নিজের করে, সমাজ সংস্কার অগ্রাহ্য করে ভালোবাসাকে জয়ী করার পথে এগিয়েছে। সময় হয়ত এভাবেই এগিয়েছে নতুন প্রভাতের পথে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে দ্বারিকা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে এই বসন্তমঞ্জরীকে, সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে বন্ধু যাদুগোপালকে সে জানিয়েছে, "হিন্দুত্ব নিয়ে আমার গর্ব আছে। তবে যে মানুষ নিজের ধর্মের দোষ ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা না করে, সে নিজের ধর্মকে ভালোবাসেনা! ধর্ম মানে তো কতগুলি সংস্কারের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস নয়! বাপ-মায়ের দোষে যদি একটি মেয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে, তবু যে সমাজ সেই মেয়েটিকে শাস্তি দিতে চায়, চিরকালের জন্য তাকে নরকে ঠেলে দেয়, তা হলে সেটা আবার কোনো সমাজ হল নাকি? সে সমাজ

গোল্লায় যাক! সমাজের নির্দেশ আমি মানব না, তবু আমি হিন্দুই থাকব।"[২৬] বসন্তমঞ্জরী নিজে এই বিয়েতে রাজি হতে না চাইলে দ্বারিকা বলতে পেরেছে, "জোর করে নয়, গোপনে নয়, পাপবোধ নিয়েও নয়, আমি তোকে সসম্মানে চাই।"[২৭] এই বোধের জাগরণই হয়ত সময়কে এগিয়ে নিয়েছিল নতুন পথে।

উনিশ শতকের প্রান্তভাগে এসে উপন্যাসে ভরতের বন্ধু ইরফান জেনেছে ডারউইনের বিবর্তনবাদ। বুঝেছে ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত সৃষ্টির ইতিহাস আসলে সত্য নয়। নবচেতনায় জাগ্রত ইরফান বলেছে, "তুই আমার বিপদ বুঝতে পারছিস না ভরত! আমি ফিরে যাব মুর্শিদাবাদে, আমার নিজের সমাজে। সেখানে সবাই কোরান হাদিসের প্রতিটি বাক্য ধ্রুব সত্য বলে মনে করে। ভক্তি ভরে পাঁচ ওকত নামাজ পড়ে, রোজার মাসে সারাদিন মুখে এককোঁটা জল পর্যন্ত নেয় না। মৌলভি সাহেবের নির্দেশ সেখানে ইংরেজ সরকারের আইনের চেয়েও বড়। তার মধ্যে আমি থাকব কী করে? আমার যে বিশ্বাস টলে গেছে। অবিশ্বাসের কথা আমি মুখ ফুটে বলতেও পারব না। তোদের হিন্দুদের মধ্যে তবু নাস্তিকের স্থান আছে, আমাদের সমাজ নাস্তিককে একেবারে সহ্য করে না।"[২৮] এই বোধের জাগরণেই তো উনিশ শতকের নবজাগরণের ভিত্তিভূমি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে ভূমিসূতাকে পাওয়া গেছে নতুন রূপে। ভরতের আশ্রয় থেকে পথে নেমে তার স্থান হয়েছে থিয়েটার জগতে, নতুন নাম হয়েছে নয়নমণি। গিরিশ ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখরের দলে যোগ দিয়ে সে পৌঁছেছে খ্যাতির শিখরে। যদিও এই পথেও প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রক্ষা করেছে নিজের সতীত্ব। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছে পুরুষকে বাদ দিয়ে নারী একাও বাঁচতে পারে। গঙ্গামণিকে সে বলতে পেরেছে, "তোমার বাবা একজন ছিল ঠিকই। সে তোমার মাকে বিয়ে করেনি। তোমাকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেয়নি। তুমি যখন জন্মেছিলে তখন কি এসব কিছু জানতে? তোমার বাবা

মায়ের বিয়ে হয়নি এই জেনেই কি তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে? আসনি, তাই না? তা হলে তোমার কোনো দোষ নেই। বাপ-মা যদি বিয়ে না করে, সমাজের চোখে কোনো দোষ করে, তার জন্য সন্তান দায়ী হতে যাবে কেন? সন্তান কেন সারাজীবন বেজন্মা হয়ে থাকবে? দিদি, তুমি নিজেকে কখনও পতিত বলবে না, পাপী বলবে না।"[২৯] নিজের নারীত্ব রক্ষা করেই নয়নমণি অর্জন করেছে প্রবল ব্যক্তিত্ব। 'সেই সময়' উপন্যাসের সময় পরিধি থেকে বেরিয়ে 'প্রথম আলো'র সময় পরিধি এভাবেই নারী জীবনের উত্তরণের সাক্ষ্য বহন করেছে।

'প্রথম আলো' উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিধির বিস্তারের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে সময় সন্ধানের পথে এগিয়েছেন, উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে শশিভূষণকে দেখা গেছে একটি বিধবা কন্যাকে বিবাহ করে ত্রিপুরা সরকারের চাকরি ছেড়ে বাস করছেন ফরাসি রাজত্ব চন্দননগরে। ইংরেজ রাজত্বে না থাকার সংকল্প তিনি বজায় রেখেছেন। এই পর্বে এসে দেখা গেছে ভরত পাটনা শহরে একটি ব্যাঙ্কে কর্মরত। ভূমিসূতাকে হারিয়ে ফেলার পর বেশ কিছু বছর ভরত ওড়িষ্যাতে কাটিয়েছে। তারপর সে পৌঁছেছে কটক শহরে। এই শহরে ঔপন্যাসিক জেগে উঠতে দেখিয়েছেন দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই মুসলমান সমাজ কংগ্রেস সম্পর্কে সন্দিহান ছিল, এমন পরিস্থিতিতে গো-রক্ষাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজ উৎসাহী হয়ে পড়লে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের বিভেদ রেখা আরও স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল। ভরতের সহকর্মী বিষ্ণুকান্ত সহায়ের পুত্র শিউপূজন উপন্যাসে কংগ্রেসের বিশ্বস্ত কর্মী ও গোঁড়া হিন্দু। গোরক্ষাই তার কাছে ধর্মরক্ষা। পাটনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে, মির্জা খোদাবক্স নামে একজন মুসলমান পুলিশ অফিসার ভরতকে তার বাড়িতে স্থান দিয়ে তাকে রক্ষা করেছে। ভরত ভেবেছে কংগ্রেসে যোগ দিতে মুসলমানরা এমনিতেই দ্বিধান্বিত, এই সব ঘটনা ঘটলে তারা আরও পিছিয়ে যাবে। তার বন্ধু ইরফানের কথা

মনে পড়ে। সে আছে মুর্শিদাবাদে। ইরফানই তাকে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, এখন ইরফানও সন্ধিহান হয়ে উঠবে!

উপন্যাসে ভরত ভূমিসূতার সন্ধান না পেয়ে যখন বিধ্বস্ত, সেই সময়েই সে পেয়েছে ভূমিসূতার মত একটি মেয়ে মহিলামণিকে। মহিলামণি বালবিধবা বুদ্ধিমান রমণী। উপন্যাসে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ের সময় তার যোগ্যতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন রবি। 'সেই সময়' উপন্যাসের বালবিধবা বিন্দুবাসিনী পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে হারিয়ে গেছে অন্ধকারের অন্ধকূপে। 'প্রথম আলো'তে সময় পরিবর্তিত। মহিলামণি বাড়িতে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে, গান-বাজনার চর্চা করেছে। রবির উদ্যোগে ভরত ও মহিলামণির বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে ব্রাহ্মমতে। বছরান্তে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে মহিলামণি, পুরীতে গিয়ে তারা গড়ে তুলেছে সুখের সংসার। যদিও ভরতের এই সৌভাগ্য বেশীদিন সয়নি, আকস্মিক একটি অপঘাতে মহিলামণির মৃত্যু হল। ভরত আবার চ্যুত হয়েছে তার স্থিত জীবন থেকে। ভরতের বন্ধু দ্বারিকা ও বসন্তমঞ্জরী ভরতকে খুঁজে পেয়েছে প্রয়াগে, উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়। এলাহাবাদের তারা ভরতকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে চেয়েছে, কিন্তু ভরত এই আশ্রয় ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছে পথে। স্ত্রী বিয়োগের পর সংসারের পাট চুকিয়ে, সন্তানকে শ্বশুরালয়ে রেখে সে ভ্রাম্যমাণ। দীর্ঘ সময় সে যাপন করেছে সম্পূর্ণ অসার মন নিয়ে। হঠাৎ একটি নারীকে নিয়ে দুই পুরুষের লড়াই তার সম্বিৎ ফিরিয়েছে।

ভ্রাম্যমান জীবনে সে পৌঁছেছে নাগপুরে। এখানে এসে সে দেখেছে প্লেগ কমিশনের প্রধান র‍্যান্ড এবং আয়াস্ট নামে দুজন বিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষদের হত্যাকারীদের ধরার জন্য চলছে চরম দমন ও পীড়ন। পুণার কতগুলি মারাঠি যুবকই এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তা জানার পর থেকে ইংরেজ সরকার তাদের আরও কঠোর হাতে দমন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ইংরেজ শাসকরা এই হঠকারীদের খুঁজে বের করে ফাঁসির

দড়িতে ঝুলিয়ে সকলের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়। ভরত লক্ষ্য করেছে, "এদেশের বহু মানুষেরই এখনও স্বাধীনতা-পরাধীনতার বোধ নেই। রাজশক্তিকে তারা শুধু ভয় পায় না, ভক্তিও করে। শাসকরা এদেশী না বিদেশি, তা নিয়েও তারা মাথা ঘামায় না। বিশ্বাসঘাতকতা যেন অধর্ম নয়, সামান্য পাঁচ-দশ টাকার জন্য নিজের বন্ধু বা আত্মীয়কে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যায়।"[৩০] এরপর ভরত এসে পৌঁছেছে পাটনা শহরে। সেখানে সে খুলেছে ইংরেজি শেখাবার স্কুল। একাকী জীবনে তার একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠেছে এই স্কুল। শেষপর্যন্ত এক ভয়াবহ অগ্নিলীলায় তার স্কুলের আসবাব সমেত সমস্ত স্কুলটিতে আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গেছে তার গড়ে তোলা জীবন। পাটনার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক হয়েছে ছিন্ন। এরপর ভরত কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পৌঁছেছে কলকাতা।

নতুন শতাব্দীতে কলকাতা পৌঁছে ভরত নতুন চোখে দেখেছে কলকাতাকে। ক্লাসিক থিয়েটারে নাটক দেখতে গিয়ে ফিরে পেয়েছে ছাত্রজীবনের বন্ধু ইরফানকে। যে ইরফান ছাত্রজীবনে ডারউইনের তত্ত্ব পড়ে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল সে ভরতকে জানিয়েছে, "ওরে ভাইরে, ধর্ম না আঁকড়ে ধরলে কি সমাজে টেকা যায়, না উন্নতি করা যায়? তুই যদি ধর্ম না মানিস, তা হলে তুই কে? হিঁদুও না, মোছলমানও না, কুষ্ঠরোগীর মত অস্পৃশ্য। আমি এখন দিনে পাঁচ ওয়ক্ত নামাজ পড়ি, এই শরীরে আল্লার করুণার স্পর্শ পাই।"[৩১] কৃষ্ণকান্তের উইলের নাট্যরূপ 'ভ্রমর' - এর অভিনয়ে ভরত দেখতে পেয়েছে ভূমিসূতাকে, সমাজের চোখে যে প্রখ্যাত অভিনেত্রী নয়নমণি। উপন্যাসে বসন্তমঞ্জরী, দ্বারিকার স্ত্রী বার বার অলৌকিক উপায়ে ভরতকে মূল কাহিনী সূত্রে যুক্ত করেছে। দ্বারিকা ভরত ও ভূমিসূতাকে যুক্ত করতে চেয়েছে, ভরতকে বলেছে, "ছিঃ ভরত! তুই এত কাপুরুষ। ও মেয়ে তো ছাইগাদার মানিক। হাড়কাটা গলির নরক থেকে আমি বসন্তমঞ্জরীকে উদ্ধার করে এনেছি। সমাজের পরোয়া

করিনি। আর তুই ওই ভূমিসূতাকে থিয়েটারে গিয়ে নষ্ট হতে দিলি? ধরে রাখতে পারলি না?”[৩২] ভরত দ্বারিকার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ভূমিসূতাকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় নিযুক্ত হতে চায়নি, সে যুক্ত হয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে।

অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্র ঘোষের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভরত। পৌঁছেছে মেদেনিপুর শহরে। সেখানে সে গীতা ও তলোয়ার স্পর্শ করে দীক্ষিত হয়েছে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির কাজে। দীক্ষার শপথ গুলিছিল, “সোসাইটির তরফ থেকে যখন যা আদেশ করা হবে, প্রত্যেক সদস্যকেই তা পালন করতে হবে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড। দেশের শত্রুদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রয়োজনে ডাকাতি করতে হবে। সোসাইটি যদি কোনও সদস্যকে অন্য কোথাও যাওয়ার নির্দেশ দেয়, তাহলে আত্মীয় বন্ধুদের তা জানানো চলবে না, কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই চলে যেতে হবে। দেশের কাজে সর্বস্ব সমর্পণ করতে হবে, নিজের বিষয় সম্পত্তি ও টাকাকড়ির ওপরেও অধিকার থাকবে না। ধরা পড়লে দ্বীপান্তর বা ফাঁসি বা দীর্ঘ কারাবাসের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, বিচারের সময় সহকর্মীদের সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করা যাবে না।”[৩৩] বারীন্দ্র – যতীন বাড়ুজ্যের সহকর্মীরূপে ভরত যোগ দিয়েছে, দুটি ডাকাতির অভিযানেও। যদিও অরবিন্দ – বারীন্দ্রের এই গুপ্ত সমিতি ভেঙে গেছে অচিরেই।

ভরত আবার যুক্ত হয়েছে ভ্রাম্যমাণ জীবনে। হঠাৎ দার্জিলিং-এ পৌঁছনোর আকাঙ্ক্ষায় সে পৌঁছেছে কার্শিয়াং-এ। সেখানে দীর্ঘদিন বাদে দেখেছে রাধাকিশোরকে, রক্তের টান অনুভব করলেও যুক্ত হতে পারেনি তার সঙ্গে। ভেবেছে, “রাধাকিশোরের যদি মনে হয় সে কোনো মতলবে এসেছে? এই পাহাড় অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন নয়, কিন্তু এখানেও গুপ্ত ঘাতক নিয়োগ করা যেতে পারে। ভরতের শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগল। নিয়তি? ...নিয়তি তাকে বার বার বিপদের মুখে ফেলে দেয়। সেই

নিয়তিই তাকে এখানে টেনে এনেছে আবার কোনও কৌতুক করার জন্য? না, এবার আর ভরত সেই ফাঁদে পা দেবে না। দার্জিলিং যাওয়া হল না, ভরত ফিরে এল কলকাতায়। দু'দিন পরে কোনও চিঠি না লিখে সে রওনা হল মেদেনিপুরের দিকে।"[৩৪] সেখানে গিয়ে আবার যুক্ত হয়ে পড়ল বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে। ভরতের মেদেনিপুরে বাস সূত্রেই ঔপন্যাসিক যুক্ত করেছেন ক্ষুদিরাম বসুকে।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষিত যুব সমাজ বুঝেছে, "কোটি কোটি পরাধীন মানুষের অপমানিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মুখ।"[৩৫] হেম বাড়ুজ্যেকে সঙ্গে নিয়ে ভরত আবার পৌঁছেছে কলকাতায়। দেখেছে সবাই উত্তেজিত বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে। বঙ্কিম রচিত 'বন্দেমাতরম্' শব্দটি শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। কোনো হরতালের ডাক ছাড়াই সব দোকানপাট বন্ধ। কোনো সংগঠন ছাড়াই দলে দলে সাধারণ মানুষ এক হয়েছে। স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে শুরু হয়েছে বিদেশি বর্জন। পোড়ানো হয়েছে লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা। যদিও এসবের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হিন্দু মুসলিম বিভেদের ভেদরেখা। বহু মুসলমান বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা চেয়েছে বঙ্গভঙ্গ, ধর্মের ভিত্তিতে একই ভাষাভাষী গোষ্ঠী হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত। ইরফান ভরতকে জানিয়েছে, "জাতিগতভাবে মুসলমানরা হিন্দুদের আধিপত্য মেনে নেবে কেন? হিন্দুদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য মুসলমানদের এখন পৃথক আইডেনডিটি দরকার। সেই জন্যই আমরা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করি। মুসলমান প্রধান একটা আলাদা রাজ্য পেলে আমরা ছাড়ব না কিছুতেই।"[৩৬] অঙ্কুরিত হয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ। একদিকে হিন্দু বাঙালী বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গর্জে উঠেছে, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি হয়ে উঠেছে তাদের বীজমন্ত্র। অন্যদিকে ঢাকার নবাব বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে একত্রিত করেছে মুসলিম সমাজকে, দেশ এগিয়েছে বিভাজনের পথে।

অরবিন্দ-বারীন্দ্রের গুপ্ত সমিতি সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে এগিয়েছে। ‘যুগান্তর’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তারা শুরু করেছে ইংরেজ বিরোধী চরমপন্থা। ভরত-বারীন্দ্র-হেম ফুলার সাহেবকে হত্যার পরিকল্পনায় পৌঁছেছে শিলং শহরে। সেখান থেকে ফুলার সাহেব বেরিয়ে পরলে তাকে ধরতে গিয়ে তারা পৌঁছেছে প্রথমে গৌহাটি, তারপর বরিশাল শেষে রঙপুর। ফুলার সাহেবকে ধরতে পারা আর সম্ভব হয়নি। অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় তারা ডাকাতির পরিকল্পনা করেছে, আর এই ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাদের সমস্ত বিপ্লবী পরিকল্পনা হয়ে গেছে ধ্বংস।

ভয়াবহ ভাবে আহত অবস্থায় ভরতকে একটি ভাঙা মন্দির থেকে উদ্ধার করেছে দ্বারিকা ও বসন্তমঞ্জরী। ভূমিসূতাকে সন্ধান করে যাদুগোপাল ও দারিকা ভরতের শ্রুশ্রুষার দায়িত্ব দিয়েছে। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে ভরতকে। যদিও তাদের মিলনের পথ হয়নি প্রশস্ত। ভরতকে সুস্থ করে ভূমিসূতা নিঃশব্দে ফিরে গেছে নিজের পুরোনো জীবনে, ভরতও আবার দেশের কাজে উৎসর্গ করতে চেয়েছে জীবন। বলেছে, “তবু লড়াইটা শুরু করতে তো হবে কোনও এক সময়। চিরকালের জন্য যারা পরাধীনতা মেনে নেয়, তারা কি পূর্ণ মানুষ হতে পারে? আমরা হয়ত তেমন কিছুই পারব না, এমনি এমনি প্রাণটা যাবে, তবু ইংরেজ শক্তির মতন এক বিশাল দৈত্যের অধীনতা মেনে নিইনি, আঘাত দিতে চেয়েছি, এই গর্বটুকু নিয়ে মরতে পারব।”[৩৭] ভরতের প্রতি অভিমানে ভূমিসূতা কাশীতে পৌঁছেছে, ভরতও পৌঁছেছে তার সন্ধানে। সেই কাশীতেই ভরত ঘটনাচক্রে পেয়েছে ত্রিপুরার রাজা তার ভাই রাধাকিশোরকে, দীর্ঘকাল পরে জন্মপরিচয় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাধাকিশোর তাকে মাসোহারা দিয়ে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে, কিন্তু ভরত আর সেই সম্পর্কের জালে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। যদিও একটা মুক্তি সে অনুভব করেছে। ভূমিসূতাকে ফিরে পেয়ে একটা অনন্ত প্রশান্তির মধ্যে প্রবেশ করেছে ভরতের জীবন।

উপন্যাসের ‘প্রথম পর্ব’ -এর ‘দশম পরিচ্ছেদে’ যখন প্রথম রবীন্দ্রনাথের দেখা মেলে তখন তিনি বাস করছেন চন্দন নগরের গোলন্দপাড়ায় গঙ্গার ধারে মোরান সাহেবের বাগান বাড়িতে। নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর ছত্রছায়ায় থাকা সদ্য যুবক তখন রবি। ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন “কুড়ি বছর পূর্ণ করে সদ্য একুশে পা দিয়েছে সে।”[৩৮] অর্থাৎ সালটা ১৮৮১। এই বছরেরই ৭ ই মে তিনি কুড়ি পূর্ণ করে একুশে পা দিয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, “ইদানিং সে বাইরের লোকের সংস্পর্শ পারতপক্ষে এড়িয়ে যেতে চায়, এমনকি আত্মীয় স্বজনের সামনেও অস্বস্তি বোধ করে। এই সংসারে আর যা কিছুরই অভাব থাক, অযাচিত মন্তব্য বা উপদেশ দেওয়ার মানুষের অভাব নেই।... একবার নয়, দু দুবার রবিকে বিলেতে পাঠানো হয়েছিল ব্যারিস্টার কিংবা আইসিএস হয়ে আসার জন্য। দুবারই সে ব্যর্থ হয়েছে।”[৩৯] ‘রবিজীবনী’ -র পাতা খুঁজলে দেখা যায় ১৮৮১ সালের ২২ শে এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বারের জন্য বিলাত যাত্রা করেছিলেন। এই সময়ে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের কারণে তাঁর আর বিলেত পৌঁছনোই হয়নি সেবার। মাদ্রাজ থেকেই তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। প্রশান্ত কুমার পাল জানিয়েছেন, “জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সস্ত্রীক চন্দননগরে ‘তেলেনিপাড়া বাড়ুজ্যেদের বাগান’-এ অবস্থান করেছিলেন। যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ৭ ই জৈষ্ঠ্য [বৃহ 19 MAY] একটি পত্রে [অপ্রকাশিত] মহর্ষিকে জানিয়েছেন, জ্যোতিবাবুরা ফরাশডাঙ্গার বাগানে আছেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।”[৪০] সকলের কাছে রবি যখন ব্যর্থ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, ঠিক সেই সময়েই কাদম্বরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছে ত্বরান্বিত। “দিন কাটছে যেন স্বর্গের এক একটি দিন। প্রতিটি মুহূর্ত এক এক বিন্দু অমৃত। সারাদিন কোনো পরিকল্পনা নেই, কোনো উদ্বেগ নেই, কোনো কর্তব্য নেই, কোনো দায়িত্ব নেই। যখন যা মন চায় তাই করা যায়। ইচ্ছে করলে বাগানে গিয়ে দোলনায় বসা যায়, গাছ থেকে ফল পাড়া যায়, নদীতে নৌকা বিহারে যাওয়া যায়, আবার ঘন্টার পর ঘন্টা বিছানায় বুকে

বালিশ দিয়ে উপুর হয়ে শুয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করলেও বাধা দেবেনা কেউ। তিনজন একসঙ্গে থাকলে গান হয়, গানের পর গান, নতুন নতুন গান। সুরের তরঙ্গই আনন্দের তরঙ্গ। সেই সঙ্গে হাসির উচ্ছলতা। জ্যোতিদাদা জীবনকে উপভোগ করতে জানেন, এক একদিন এক একরকম পরিবেশ... কাদম্বরী রবির চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়, তিনি এখনো জননী হননি, তিনি এক অসংসারী নারী, তাঁর শরীর ও মন জুড়ে রয়েছে শিল্পের সুষমা। এই লাজুক দেবরটিকে প্রীতি ও বন্ধুত্ব দিয়ে তিনি সব সময় আপন করে রাখেন আর রবিও তাঁর মন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিতে পারে এই নতুন বউঠানেরই কাছে।"[৪১] এই দুজনের সান্নিধ্যেই রবির মন মুক্ত হয়েছে। বিশ্বের মাঝে নিজের স্থান খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি এই সময় থেকেই।

পিতার পরিচয়ের বাইরে নিজের পরিচয় গড়ে তোলার পথ খুঁজে পেতে চেয়েছেন রবি। শুরু হয়েছে আত্ম অনুসন্ধান তথা জীবন অনুসন্ধান। একুশ বছর বয়েসে পৌঁছে বুঝতে চেয়েছেন নিজেকে। বাল্যকাল থেকেই কবিতা লিখেছেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়েসে প্রায় তিন চারটি গ্রন্থের গ্রন্থকার তিনি। কবিত্ব শক্তির খ্যাতি ছড়িয়েছে কিছুটা হলেও। গায়ক হিসেবেও নাম কুড়িয়েছেন পরিচিত মহলে। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষা তাঁকে ঋদ্ধ করেছে। ঠাকুর বাড়ির নাট্য উৎসবে অভিনেতা হিসেবেও খ্যাতি কুড়িয়েছেন। কিন্তু গায়ক বা অভিনেতা হিসেবে সে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয়। তাঁর প্রথম ও একমাত্র ভালোবাসা কবিতা। কবি হিসাবে সার্থকতাই তাঁর কাছে আসল সার্থকতা। যদিও এই সার্থকতার পথ সহজ নয়। ঔপন্যাসিক রবিজীবনের বাস্তব তথ্যকে সাহিত্যের সত্য করে তুলে দেখিয়েছেন তাঁর 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য বিশেষ গুরুত্ব বা সম্মান আদায় করতে পারেনি। কবি বন্ধু প্রিয়নাথ সেন, যাঁর মতামতকে রবি বিশেষ শ্রদ্ধা

করতেন তিনি রবিকে প্রায় ভৎসনাই করেছিলেন। ‘রবিজীবনী’র পাতা ওলটালে এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। যদিও ঔপন্যাসিক যেসব মন্তব্যগুলো যুক্ত করেছেন প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে সেগুলো অক্ষয়চন্দ্র সরকার ‘সাধারণী’ পত্রিকায় ‘আশ্বিন’ সংখ্যায় করেছিলেন। যদিও এই কাব্যের জন্যই ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রবিকে সম্মান জানাতে দূত প্রেরণ করেছিলেন। তেলেনিপাড়ার বাড়ুজ্যেদের বাগান থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখরা ঠিক কবে চন্দননগর ত্যাগ করেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। রবীন্দ্রনাথ ‘ছেলেবেলা’য় লিখেছেন কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হয়েছিল মোরান সাহেবের বাসায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরা কবে চন্দননগর ছেড়ে কলকাতা ফিরেছিলেন তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে প্রশান্ত কুমার পাল জানিয়েছেন, ১৮৮১-র ১৬ ই অগ্রহায়ণ অর্থাৎ 30 NOV দ্বিপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সম্ভবত এই বিবাহের পূর্বেই তারা কলকাতা ফিরে এসেছিলেন।

কবিতার চেয়েও রবীন্দ্রনাথের গদ্য পরিচ্ছন্ন, নির্মেদ ও ধারালো। স্কুল পালানো ছেলে হলেও তাঁর পড়াশোনার বিস্তার অসীম। প্রাচ্য পাশ্চাত্য এই দুই জগতেই তাঁর অনায়াস গতায়াত। ‘ভারতী’ -র বৈশাখ ১২৮৮ সংখ্যায় ‘বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা’ এই প্রবন্ধে তিনি শেলির ‘Queen Mab’ কাব্য থেকে দীর্ঘ অংশ, ওয়ার্ডওয়ার্থের একটি কবিতা ও কয়েকটি কাব্যানুবাদ ব্যবহার করেছিলেন। পশ্চিমী সাহিত্যের সাম্প্রতিক ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রবি বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে গদ্যেরই যুগ আসছে। চন্দন নগরে তিনি ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ নামে একটি উপন্যাস শুরু করেছিলেন। ‘ভারতী’র পাতায় তাঁর ক্ষুরধার গদ্যের মধ্যে অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এই ‘ভারতী’র পাতাতেই তাঁর রাজনৈতিক ভাবনারও জাগরণ। রবিজীবনীকার লিখেছেন “চন্দননগরে থাকার সময় কেবল কবিতা ও গান নয়, অন্যান্য গদ্যরচনাও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।”[৪২] ‘ভারতী’ র পাতায় প্রকাশিত

‘জুতা ব্যবস্থা’ তিনি লিখেছিলেন ‘ইংলিশ ম্যান’ পত্রিকায় লিখিত একটি মন্তব্যের বিরোধিতা করে। ‘ইংলিশ ম্যান’ পত্রিকা একসময় লিখেছিল ‘kick them and speak to them. Age lat pechoo bat’ তিনি তাঁর উত্তরে জবাব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত হয়ত এখানেই। উপন্যাসে ত্রিপুরার রাজবাড়ি থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করতে এসে ব্রিটিশ বিদ্বেষী শশিভূষণ তাঁকে বিশেষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। উপন্যাসে শশিভূষণের মন্তব্য, “আপনি বাঙালি জাতটাকেও বলেছেন আর কতকাল জুতো খাবে? Perfect piece of political writing! ওই লেখাটির জন্য বিশেষ করে অভিনন্দন জানাচ্ছি।”[৪৩] ‘জুতা ব্যবস্থা’ প্রকাশিত হয়েছিল ভারতীর জৈষ্ঠ সংখ্যা ১৮৮০। মন্তব্যটি ইংলিশম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ৩০ শে এপ্রিল ১৮৮০ তারিখে। প্রশান্ত কুমার পাল জানিয়েছেন, উক্ত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশীয় পত্রিকায় যে আলোড়ন চলছিল, রবীন্দ্রনাথ মুসৌরী থেকে সম্ভবত সেই উত্তেজনার মধ্যেই ফিরে আসেন ও তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রবন্ধটি রচিত হয়। কুড়ি বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথের লেখনী তখনই কী পরিমাণ তীব্র ব্যঙ্গ বর্ষণে সক্ষম হয়ে উঠেছিল, রচনাটি তারই একটি নিদর্শন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ভুলক্রমে রচনাকাল ১৮৯০ মুদ্রিত হয়েছিল, ওটা ১৮৮০ হইবে। - একথা ঠিক মনে করার কোনো কারণ নেই, ‘১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত’ এই উল্লেখটি রচনার ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিরই অন্তর্গত বলে প্রশান্ত কুমার পাল মনে করেছেন এবং তাঁর মতের সঙ্গে যথার্থই সহমত হতে দ্বিধা নেই। ইংলিশ ম্যানের মন্তব্যকে সরকারি নীতি ধরে নিয়ে তিনি প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন যে, “যে হেতুক বঙ্গালীদের শরীর অত্যন্ত বেজুত হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের অধীন যে বাঙ্গালী কর্মচারী আছে তাহাদের প্রত্যহ কার্য্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লয়া হইবে।’ এরপর বাঙালীর দাস মনোভাবকে কল্পনা করে দশ বছর পরের একটি কল্পচিত্র রচনা করেছেন। লিখেছেন, “আজকাল ট্রেনে হউক, সভায় হউক, লোকের সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করে ‘মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের নিবাস?

মহাশয়ের কয় ঘা করিয়া জুতা বরাদ্দ? আজকালকার বি-এ এম-এ রা নাকি বিশ পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। সেই আমলের শ্রেষ্ঠ আশীর্বচন 'পুত্র পৌত্রানুক্রমে গবর্মেণ্টের জুতা ভোগ করিতে থাক, আমার মাথায় যত চুল আছে, তত জুতার তোমার ব্যবস্থা হউক।"[৪৪] এর আগে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' -এ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে কিছু রাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু 'জুতা ব্যবস্থা'ই তাঁর প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ। উপন্যাসে রাজনৈতিক ভাবনার উন্মেষের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সময়ের বিবর্তনের রূপরেখাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের শেষপাদে এসে উনিশ শতকের আত্মসচেতন বাঙালী রাজনীতি চেতনার প্রথম আলোতে হয়েছে আলোকিত।

উপন্যাসে সময় সন্ধানের পথে সময়ের বহুতলীয় বিবর্তনের রূপরেখাকেই ওপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবর্তনের পথরেখাকে। কাদম্বরীদেবীর সংস্পর্শে তিনি যখন উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন, কাব্যজগতে তাঁর হচ্ছে রাজ্যাভিষেক, অন্যদিকে পারিবারিক বন্ধনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বিশ্বমাঝে দাঁড়াতে চেয়েছেন। কাদম্বরী দেবীর অনুপ্রেরণাকে নিজের প্রতিভা বিকাশের পাথেয় করে নিজ প্রতিভার বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন বিশ্বলোকে। ব্যক্তিমানুষ থেকে বিশ্বমানব হয়ে ওঠার সাধনা শুরু হয়েছে এখান থেকেই। বহুদিনের যবনিকা সরিয়ে নারীমুক্তির জোয়ার যখন এসেছে ঠাকুরবাড়িতে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কাদম্বরী দেবী একাকীত্ব বা অবহেলা মেনে নিতে চাননি, রবিকে আশ্রয় করেই তিনি মেতে উঠতে চেয়েছেন পুতুলখেলায়, সন্তানহীন একাকীত্বের জীবন তিনি নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেনি। রবি তাঁর সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন, তাঁকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু গৃহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করতে পারেননি।

পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে মুক্ত হয়ে একজন গৃহবধূ বাস করছেন নিজের মতো করে। মুক্ত প্রকৃতির কোলে মুক্ত হয়েছে বাঙালীর চিরায়ত প্রথা, যেই প্রথায় 'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার'ই নারীর পৃথিবী, সেই পৃথিবী বেরিয়ে এল অন্দরমহলের বাইরে। ইউরোপীয় ধাঁচে বিলাসব্যসনে গা ভাসিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সঙ্গে নেই কোন রক্ষিতা, বরং আছে তার বিবাহিতা কাদম্বরী। এখানেই পরিবর্তনের চিহ্নকে ধরা যায়। নারী পুরুষের নর্মসঙ্গিনী আর নয়, ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করেই নারী হয়ে উঠেছে কর্মসঙ্গিনী। চন্দননগর থেকে ফিরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর অত ভিড়ের মধ্যে থাকতে চাননি। চৌরঙ্গী পাড়ায় একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা ভাড়া নিয়েছিলেন। সদর স্ট্রিটের গলিতে দশ নম্বর বাড়িতে শুরু হয়েছে কাদম্বরীদেবীর নতুন সংসার। প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন, "জ্যোতিরিন্দ্র সম্ভবত অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে চন্দননগর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এরপর তিনি চৌরঙ্গির সদর স্ট্রিটে একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে কয়েক মাস বাস করেন।... জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কোন্ মাসে বাড়িটি ভাড়া করেছিলেন তা জানা না গেলেও চৈত্র ১২৮৮ তে তিনি সেখানে ছিলেন... রবীন্দ্রনাথ এখানেও তাদের সঙ্গী হন।"[৪৫] এই বাড়িতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরীর সাহচর্যে রবি জীবনেও শুরু হয়েছিল নতুন অধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কর্মদক্ষতা অদম্য সাহস তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই সময়েই রবি প্রবেশ করতে শুরু করেছিলেন কর্মজীবনের প্রাঙ্গনে। প্রায়ই সকালে আসেন অক্ষয় চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, জানকীনাথ ঘোষালের মত আত্মীয় বন্ধুরা। 'ভারতী' -র সম্পাদনার কাজ চলে। সম্পাদক হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম ছাপা থাকলেও তিনি বিশেষ সময় দিতে পারতেন না। সমস্ত দায়িত্ব জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই পালন করতে হত।

এই সদর স্ট্রিটের বাড়িতে আসার পর রবির জীবনে বেশ কিছু পটপরিবর্তন ঘটেছিল। প্রশান্তকুমার পাল বলেছেন, "সদর স্ট্রিটের

বাড়িতে অবস্থান কালে রবির জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে।”[৪৬] ‘জীবনস্মৃতি’ তে কবি লিখেছেন, “সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছগুলি পর্বন্তরাল থেকে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের ওপর হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের ওপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোকে একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।”[৪৭] এই সময়েই তথা ১২৮৯ বঙ্গাব্দে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ফরাসিদেশের ফ্রেঞ্চ আকাদেমির অনুকরণে সাহিত্যের স্বাহ্যরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করার কথা ভাবলেন। তিনি ঠিক করলেন বাংলার সব বিশিষ্ট লেখক, পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদদের একসঙ্গে জড়ো করে একটি সারস্বত সমাজ গঠন করা হোক। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর সভাপতির পদ গ্রহণ করতেও আপত্তি করেননি। ‘জীবনস্মৃতি’তে কবি লিখেছেন, “এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।”[৪৮] রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন, “রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন ও সভাপতি হতে রাজি হন। কিন্তু অন্যান্য বিশিষ্টব্যক্তিদের সকলের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়নি।”[৪৯] ‘জীবস্মৃতি’ তে কবি লিখেছেন, “যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভাসদদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, “আমি

পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো – 'হোমরা চোমরা'দের লইয়া কোন কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলিবে না।"[৫০] এই ঘটনারই উল্লেখ উপন্যাসে তুলে এনেছেন ঔপন্যাসিক। এর পরের দু একটা মাসিক অধিবেশনেই রবি বুঝতে পারলেন কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। উপদলীয় কোন্দল শুরু হয়ে গেছে। এই সব বড় বড় মানুষগুলির প্রত্যেকেরই আত্মম্ভরিতার লম্বা লম্বা লেজ আছে, সেই লেজের বিড়ে পাকিয়ে সিংহাসন তৈরী করে তার ওপর একজন রাজা সেজে বসে থাকেন। এঁরা দূরবীনের উল্টো দিক দিয়ে দেখে জগৎ সংসারকে। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আর তেমন গা করেন না, কয়েকজন আড়ালে বলাবলি করতে লাগল ওসব ঠাকুরবাড়ির ব্যাপার, সব বিষয়েই ওরা কৃতিত্ব নিতে চায়! রবি নিরাশ হয়ে পড়লেন। বাঙালী জাতির এতদূর অধঃপতনের পরেও এঁরা সবাই একসঙ্গে হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কিছু একটা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে পারছেন না দেখে তিনি ভেবেছে, শুধুই দলাদলি আর পরনিন্দা চলতে থাকবে? রবি উপলব্ধি করলেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সাবধান বাণী কত মর্মে মর্মে সত্য। ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন সময়ের বিবর্তনের রূপরেখাকে যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এগোনো বাঙালী এগিয়েছে আরও কিছু জোরালো আলোর পথে। যদিও অন্ধকার তার ছায়াসঙ্গী চিরকাল, ভোরের সূর্যের প্রথম আলো মধ্যাহ্ন সূর্যের মত জোরালো তো নয়! তাই হয়ত ছায়া-অন্ধকার মুক্ত হতে পারেনি বাঙালী সমাজ।

যদিও এই পথে প্রথম পা বাড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির পর্দাপ্রথাকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে যিনি বাঙালী তথা ভারতীয় নারী সমাজকে এক ধাক্কায় এক শতাব্দী পার করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা ভারতের প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। চিত্রা দেব তাঁর 'ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল' গ্রন্থে জানিয়েছেন, "সত্যেন্দ্র বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পরে জ্ঞানদানন্দিনী একান্নবর্তী

ঠাকুরবাড়িতে যৌথ পরিবারের একজন হয়ে থাকতে চাননি। তিনিই প্রথম জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি ছেড়ে অন্যবাড়িতে উঠে যান স্বামী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে। বাঙালি জীবনে এর আগে এই স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়নি। ...আধুনিক জীবনে পারিবারিক ছকটি জ্ঞানদানন্দিনীই নিজের হাতে গড়ে দিলেন।"[৫১] উপন্যাসে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রথম সংবাদ পাওয়া গেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখে, কাদম্বরী রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দিতে আসা রাজদূতদের সামনে থাকতে না চাইলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন মেজবৌদি লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন আর তুমি এক রাজার দূতদের সামনে থাকতে পারবে না কেন। এই প্রসঙ্গে চিত্রা দেব তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' -এ লিখেছেন, "তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কথামতো গিয়েছিলেন লাটভবনে, নিমন্ত্রণ রাখতে। সেখানে তাঁকে দেখে সবাই প্রথমে ভেবেছিলেন 'ভূপালের বেগম', কারণ 'তিনিই তখন একমাত্র বেরোতেন'। ভোজসভায় ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তিনি তো ঘরের বউকে প্রকাশ্য রাজসভায় আসতে দেখে রাগে-লজ্জায় দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। আগে কোনও 'হিন্দু রমণী' গভর্নমেন্ট হাউসে যাননি। এখনই বা যাবার কী দরকার ছিল? সেকথা সনাতনপন্থীরা বুঝবেন কী করে? বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাই পুলকিত হয়ে লিখেছেন, 'সে কী মহাব্যাপার! শত শত ইংরেজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী সেখানে একমাত্র বঙ্গবালা!' যতই হইচই হোক-না-কেন রোগটা বড় ছোঁয়াচে। একটি দুটি করে আরও দরজা খুলতে শুরু করল।"[৫২] জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে প্রথম বিলিতি আদবকায়দা আমদানি করেছিল জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। প্রথম বাঙালী নারী হিসেবে তিনি স্বামী সঙ্গ ছাড়াই একা দুটো শিশু পুত্র-কন্যা নিয়ে ইংল্যান্ড পাড়ি দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় কর্মক্ষেত্রে কতদূর এগিয়েছে তা বুঝে তিনি পাশ্চাত্য চিন্তা চেতনাকে নিজের জীবনে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। সমান আত্মমর্যাদা নিয়ে ইংরেজি ও ফরাসীতে অনর্গল কথা বলতেও তিনি পারতেন। বহুযুগ ধরে বাঙালী হিন্দু সমাজে নারীদেহ শুধু ভোগের জন্য

ও সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হত। সেই সনাতনী নারী দেহকে তিনি নারীমানুষীতে পরিবর্তিত করার পথে এগিয়েছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী হিন্দু বাঙালি স্ত্রীলোকেরা ছিল একবস্ত্রা, অঙ্গে তাদের শাড়ি ছাড়া কোনো অন্তর্বাস থাকত না। সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে গেলেন তখন তাঁর ওই পোষাক অসভ্য বলে মনে হল। জ্ঞানদানন্দিনীর হাত ধরেই শুরু হয়েছিল আধুনিক বাঙালী নারীর শাড়ি পরার ভঙ্গি।

রবীন্দ্রনাথ তখন দুবার ইউরোপ থেকে শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ খুঁজছেন। প্রথমবার ইংল্যান্ড গিয়ে বছর দুয়েক কাটানোর পর পিতৃ আদেশে সম্পূর্ণ খালি হাতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফেরার কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারীতে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিলাত যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সেবারও ভাগিনেয় সত্যপ্রকাশের কারণে তাঁকে মাদ্রাজ থেকেই ফিরে আসতে হয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এবার বিলাত যাবার কথা উঠলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' গ্রন্থদ্বয় যথাক্রমে 'শ্রীমতি হে-কে' ও 'ভাই জ্যোতিদাদা'কে উৎসর্গ করেছিন। উভয় গ্রন্থই যে বিলাত যাত্রার আগে রচিত তা উপহারের মধ্যেই স্পষ্ট। বিলাত যাত্রায় ব্যর্থতার পর তিনি বুঝেছিলেন বাংলা লেখাই তাঁকে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠা। তিনি খুঁজতে শুরু করেছিলেন নিজের সত্তার প্রকৃত মুক্তির পথ। ঔপন্যাসিক বলেছেন, "কবি হিসাবে রবি এ পর্যন্ত তেমন কোনও অসাধারাণত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। সে অনবরত কবিতা লিখে যেতে পারে, ছন্দমিল আসে সাবলীলভাবে, কিন্তু কিছুতেই গভীরতা আসে না। বিষণ্ণতার বদলে হা হুতাশ। ...রবি কবিতা লিখতে গেলেই হয়ে যায় ছন্দবদ্ধ ব্যক্তিগত ডায়েরি কিংবা চিঠি, তাতে সার্বজনীনতার স্পর্শ লাগে না। রবি এখন তা বুঝতে পারছে কিন্তু কী করে এর থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়?"[৫৩] 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি প্রকাশ হবার পরে পাঠকের প্রশংসা পায় নি। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন প্রিয়নাথ সেনের মত

সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক মনে করেছেন "যাত্রাদলের ছোঁড়ারা এমন প্যানপ্যানানি গান গায়।"[৫৪] যদিও এই কাব্যের কারণেই তিনি ত্রিপুরার রাজার পক্ষ থেকে সম্মান পেলেন। তাঁর মনে হল, "...কবিতাগুলি তা হলে একেবারে ব্যর্থ নয়। একজন মানুষকে শোকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সে মানুষ যে সে মানুষ নয়, একজন মহারাজ এবং কবিতার সমঝদার।"[৫৫] তবুও রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে নিজের খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় এগিয়েছেন বেশ কয়েক ধাপ। বিদেশ ঘুরে এসে তিনি বুঝেছেন "ভবিষ্যতে গদ্যের যুগই আসছে।"[৫৬]

আদি ব্রাহ্মসমাজ, কেশব সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষি প্রকাশ্যে আসার ঘটনাও রয়েছে উপন্যাসে। রাজনারায়ণ বসু আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা, তাঁর মেয়ে লীলাবতীর বয়েস সতেরো, তার সঙ্গে বিবাহ হবে কৃষ্ণকুমার মিত্রের। সম্বন্ধ করা বিয়ে নয়, পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখে মনোনীত করেছে। কৃষ্ণকুমার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসাবে ঠিক করেছে তাদের বিয়ে হবে সদ্য পাশ হওয়া 'সিভিল ম্যারেজ আইন' অনুযায়ী। এতে জাতি বিচার নেই, মন্ত্র কিংবা পুরুতের কোনো স্থান নেই, তরুণ ব্রাহ্মসমাজ এটাই মানে। আদি ব্রাহ্মেরা আবার ছিলেন ঘোর বিরোধী, কারণ রেজিস্ট্রি বিয়ে মানে তো নাস্তিকতা। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই বিয়ের বিপক্ষে। কন্যা বয়স্কা ও এই বিয়ের ভালো মন্দ বিচারে সক্ষম বিবেচনা করে রাজনারায়ণ বসু এই বিবাহে কন্যার মত জিজ্ঞাসা করেন এবং মেয়েটির মতের বিরোধিতা না করে তিনি বিবাহে মত দিয়েছিলেন, যদিও রাজনারায়ণ বসু সমেত কোনো আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতাই সেই বিবাহে যোগ দেননি। ঔপন্যাসিক এই ঘটনার সম্পূর্ণ উল্লেখ করেছেন ও চন্দনগরের মোরান সাহেবের বাড়ি থেকে এই বিবাহ উপলক্ষে গান রচনা করেছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত গানের গায়কদের দলে ছিলেন। এই গায়কদলে নরেনের উপস্থিতির ঐতিহাসিক সূত্র রবিজীবনীকারও সমর্থন

করেছেন। ঔপন্যাসিক ১৮৮২ সালের একটি ঘটনার সূত্রে এই দুই যুগসূর্যকে পাশাপাশি রেখেছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে সমান্তরাল ভাবে নিজেদের কর্মযজ্ঞকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। যাঁদের আলোয় আলোকিত হবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ। ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৪ শে অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের বিয়েকে কেন্দ্র করে উল্লিখিত সমস্ত ঘটনা ঐতিহাসিক সূত্র রক্ষা করেই তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক।

প্রখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র হিসেবে মেধাবী, বি.এ পাশ করে বিলেত যান আই সি এস পরীক্ষা দিতে। সামান্য বয়সের ব্যাপারে খুঁটিনাটি জন্য তিনি পরীক্ষায় পাশ করলেও তাঁকে আটকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি মামলা করেছিলেন এবং বাধ্য করেছিলেন মামলায় জিতে ইংরেজ সরকারকে তাঁকে নিয়োগপত্র দিতে। কিন্তু মামলায় জিতে চাকরি পাওয়া গেলেও নিয়োগকারীর আস্থাভাজন হওয়া যায় না। শ্রীহট্টের সরকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করতেন সুরেন্দ্রনাথ, তাঁর শ্বেতাঙ্গ উপরওয়ালা তাঁকে মোটেই পছন্দ করতেন না, একবার আদালতের কাজে সামান্য ত্রুটি দেখিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করা হল। এই অবিচারের প্রতিকারের জন্য আবার বিলেত গেলেন সুরেন্দ্রনাথ। সেখানেও সুবিচার পেলেন না, বিমুখ হয়ে ফিরতে হল। দেশে ফিরে সুরেন্দ্রনাথ আর কোনো কাজ পেলেন না। এদেশের মানুষ কর্তাভজা। তারা কেউ সুরেন্দ্রনাথকে ছুঁতে চাইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ সরকারী চাকরি আর পাবেন না, দেশের মানুষরাও তাঁকে চাকরি দিতে চাইল না। এমন পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে ডেকে মেট্রোপলিটন কলেজে চাকরি দিলেন। যেখানে তিনি সূক্ষ্মভাবে ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করেছিলেন দেশাত্মবোধ। অন্য একজন উজ্জ্বল ছাত্র আনন্দমোহন বসু ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ‘র‍্যাংলার’ হয়ে ‘স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন’ নামে ছাত্র সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। সুরেন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন তাঁর

সঙ্গে। তিনি 'Raise of the sikh power' বক্তৃতার মাধ্যমে বোঝাতে চাইলেন যে, আদর্শের দৃঢ়তা থাকলে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধেও সংবদ্ধ হওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলি' পত্রিকার সম্পাদক। ইংরেজ শাসকের নানা অব্যবস্থার সমালোচনা করেন। এই সময়ে নরিস নামে হাইকোর্টের এক বিচারক হিন্দু বাড়ির গৃহদেবতা তথা শালগ্রামশিলাকে অবমাননা করলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকায় এই ঘটনাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে লিখলেন, ওই বিচারক সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদাপূর্ণ আসনে বসার অযোগ্য। এরপর আদালত অবমাননার অভিযোগে দু'মাসের কারাদণ্ড হল সুরেন্দ্রনাথের। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের খবর নাড়িয়ে দিয়েছিল ছাত্রসমাজকে। এই প্রথম প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখানো হল রাজশক্তির বিরুদ্ধে। ছাত্রসমাজ ক্ষেপে উঠেছিল, বিভিন্ন স্থানে সভা করে বক্তারা প্রতিবাদ জানাতে লাগল। রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ হতো এভাবেই প্রথম অঙ্কুরিত হল। সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির পর বহুস্থানে তাঁকে সংবর্ধিত করা হল। ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২ শ্রাবণ কলকাতার অনাথনাথ দেবের বাজারে একটি বিরাট জনসভা হয়। এই সভার বিবরণ বহু পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা সমসাময়িক সময় থেকে ছিল বহুগুণ এগিয়ে। তাঁর দূরদৃষ্টি, সমাজবোধ, রাজনীতিবোধ অনেক ক্ষেত্রেই সমসাময়িক হুজুগের সমধর্মিতা লাভ করতে পারেনি। 'ভারতী' কার্তিক ১২৯০ তে 'ন্যাশনাল ফান্ড' প্রবন্ধে রবি ন্যাশনাল ফান্ডের প্রধান উদ্দেশ্য political agitation বিরোধিতা করে তিনি লিখেছেন যে, "এই ব্যাপারটাই ন্যাশনাল নয় ও যাহারা বাঙ্গালা ভাষা অবহেলা করেন, ইংরেজীতে বাগ্মিতা প্রদর্শন করাই যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহারাই ইহার প্রধান, গোড়াতেই ইহার নাম হইয়াছে National Fund, ইংরাজীতেই ইহার উদ্দেশ্যে প্রচার হইয়াছে, আজ পর্যন্ত ইংরাজীতেই ইহার কাণ্ডকারখানা চলিতেছে, people রাই আমাদের সহায়, people দের

জন্যই আমরা এতটা করেতিছি, people দের উপরেই আমাদের ভরসা। এসব ভাণ করিবার দরকার কি? People রা যে তোমাদের কথাই বুঝিতে পারেনা। ইংরেজি ভাষায় তোমাদের তর্জন গর্জন শুনিয়া যে সে বেচারিরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। যে সকল political agitation একমাত্র ব্যবসায় তার উপর আমার খুব একটা ভরসা নাই। আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই, ক্রমশই তাহাকে হীন হইতে হয়। ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভরতা পাইতে পারি না। আর যদি তাহাই না পাই, তবে আসল জিনিসটাই পাইলাম না। কারণ ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্ম নির্ভরতার ফল স্থায়ী।”[৫৭] এই ভাবনার সহধর্মিতা পোষণ করেছেন স্বয়ং ঔপন্যাসিকও। ১৮৮৪ তে রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশ ভাবনা সত্যিই অভূতপূর্ব। ঔপন্যাসিক তাঁর সময় সন্ধানের পথে এভাবেই রবীন্দ্রচিন্তার প্রবাহকে যুক্ত করেছেন যা সত্যই ক্রান্তদর্শী। উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী এভাবেই বিশ শতকে এসে খুঁজে পেয়েছে চিন্তার বহুতলীয় মাত্রা।

উপন্যাসে রবির বিবাহকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক কাদম্বরী দেবী ও জ্ঞানদানন্দিনীর দ্বন্দ্বের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিত্বময়ী প্রকাশমুখী জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে চাননি কাদম্বরী। রবীন্দ্রনাথের সদ্য বিবাহিতা ভরতারিণী ঠাকুরবাড়িতে এসে হয়ে উঠেছিল মৃণালিনী। নতুন নামের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তুললেও তাকে নিয়ে মেতে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ির সকলে। জ্ঞানদানন্দিনী ইংরেজ সমাজের ধারক ও বাহক। তাঁর কন্যা ইন্দিরা পড়ে লরেটো হাউসে। জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা পড়ে বেথুন স্কুলে। বেথুন স্কুল বাংলা মাধ্যম। সেখান থেকে প্রতি বছর অনেক নামকরা ছাত্রী পাশ করে। ব্রাহ্ম দুর্গামোহন দাসের

কন্যা অবলা দাস নামে একটি মেয়ে ঠিক করেছিল ডাক্তারি পড়বে। সেই সময়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হত না। অর্থাৎ মেয়েরা ডাক্তারি পড়তে পারত না। সেজন্য শেষ পর্যন্ত তাকে পাঠানো হয়েছিল মাদ্রাজে ডাক্তারি পড়তে। অবলার জেদ দেখে ইংরেজ সরকার তার জন্য মাসিক কুড়ি টাকা বরাদ্দ করেছিল। পরে অবলা দাস জগদীশচন্দ্র বসুকে বিবাহ করে অবলা বসু হন এবং নারী শিক্ষার প্রসারে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ইলবার্ট বিলের সময়ে সাহেবেরা যখন দেশীয় মানুষদের বিদ্যে বুদ্ধিকে হেয় করে চলেছিল তখন কামিনী সেন নামে একটি তেজস্বিনী ছাত্রীর নেতৃত্বে বেথুনের মেয়েরা বিক্ষোভ জানিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে ভরার আদেশ দিলেও বেথুনের সব ছাত্রী হাতে কালো ফিতে বেঁধে এসেছিল। অন্যদিকে লোরেটো হাউজে যীশুর জয়গান করে নিয়মিত প্রার্থনা করতে হয়। লরেটো হাউসে স্বদেশীয়ানা নিষিদ্ধ। ছাত্রীরা ভালো ইংরেজি শেখে। বিলিতি আদব কায়দা রপ্ত করতে হয়। পাস করার পর তারা বড় বড় সিভিলিয়ান ও ব্যারিস্টারের পত্নী হিসেবে বেশ মানিয়ে যায়। উপন্যাসে সরলার বেথুন স্কুল তাঁর মনে ইংরেজ সরকারের প্রতি বিরোধিতার ভাব এনেছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।’ তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাঙালীর স্বাধীন চেতনার এহেন প্রকাশ নাড়িয়ে দিয়েছে সময়কে। যদিও রবির স্ত্রীর জন্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বরাদ্দ করলেন লরেটো হাউজ, তাকে রাখলেন নিজের কাছে। কাদম্বরী পড়ে রইলেন একাকীত্বের অন্ধকারে। নব্যসভ্যতার প্রথম আলোতে আলোকিত সব নারীই পেরে ওঠেনি সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠতে। কারও অন্তঃকরণ উজ্জ্বল হয়ে নিভৃতে সেই আলো ছড়িয়েছে অন্যের মানসজগতে। কেউ বা নিজের ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল করেছে জগৎ ও জীবনকে।

উপন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘সরোজিনী’ জাহাজের শুভারম্ভের ঐতিহাসিক তথ্যকে সাহিত্যের সত্য করে তুলেছেন। সরোজিনীর আগেও ফ্লোটিলা কোম্পানি জাহাজ চালিয়েছে, কিন্তু সরোজিনী স্বদেশী জাহাজ, বাঙালীর জাহাজ, বাঙালীর গর্ব। এই জাহাজ নিয়ে ভারতবাসীর উৎসাহ প্রবল। ভারতবাসীর সদ্যজাগ্রত জাতীয়তাবোধের পালে হাওয়া লাগিয়েছিল এই সরোজিনী। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, ‘সরোজিনী’র সাফল্যের ছাত্ররাও উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জাতীয়তাবোধে জেগে উঠতে শুরু করেছে আপামর ভারতবাসী। “আপনারা বাঙালি, বাঙালির জাহাজ থাকতে আপনারা ইংরেজদের জাহাজে যাবেন কেন? দেশের টাকা কেন দেবেন বিদেশীদের। সাহেবরা কি আমাদের মানুষ বলে মনে করে? কতরকম অপমান করে, মনে করে দেখুন! আমাদের মঙ্গলের জন্যই ঠাকুরবাবুরা এখানে জাহাজ এনেছেন। তবু কি বিদেশীর জাহাজে যেতে আপনাদের মন চায়?”[৫৮] একটি বারো তেরো বছরের লুঙ্গি পরা ছেলে নদীতে নেমে পড়ে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লেগেছিল। উপন্যাসে রবির মনে হয়েছে, “ইংরেজের সঙ্গেও যে প্রতিযোগিতায় নামা যায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই চেতনা জাগল কী করে? সিপাহী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর এদেশের মানুষদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, ইংরেজরা অপরাজেয়। শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা মহাশক্তিধর তারা সব দিক থেকেই এই কালো মানুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আবার কি সেই ভুল ভাঙছে? একটি সাধারণ কিশোরও সাহসের সঙ্গে সেই কথা বলতে পারছে।”[৫৯] যদিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই স্বপ্নের স্বদেশী জাহাজ রক্ষা পায়নি শেষ পর্যন্ত। জাতীয়তাবোধ তখনও স্বদেশী কোম্পানিকে রক্ষা করার মত প্রবল হয়নি ভারতীয়দের মনে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। বিদেশী ফ্লোটিলা কোম্পানির সঙ্গে অসম লড়াইতে তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। শুধু আর্থিক ভাবে নয় সর্বতোভাবে তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। একদিকে স্ত্রী বিয়োগ অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের বিরাগভাজন হয়ে তিনি হারালেন পরিবারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্মান।

জমিদারির আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষার দায়িত্ব ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবেন্দ্রনাথ দায়িত্ব দিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের ওপর। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ থেকেও চ্যুত করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ পেলেন রবি। চব্বিশ বছর বয়সে রবিকে একটা জুড়িগাড়ি উপহার দিলেন দেবেন্দ্রনাথ যা তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের বাড়িকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ছবি উঠে এসেছে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রসের প্রথম বোম্বাই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিছু কিছু রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। উপন্যাসে উনিশ শতকের শেষপাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক সূত্রকে ঔপন্যাসিক সূক্ষ্মভাবে তুলে এনেছেন। তুলে এনেছেন জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের ইতিহাস। উঠে এসেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, অ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম ও তাঁর থিয়োসফিস্ট সোসাইটি। যদিও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা তাঁর সমসাময়িক চিন্তাশীলদের চেয়ে ভিন্ন। উপন্যাসে রবি ভেবেছন, "সবটাই যেন কথার ফুলঝুরি, উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিতদের বাকচাতুর্যই প্রধান হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর যোগ কোথায়? সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, একযোগে ভারতেও অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং পরীক্ষার্থীদের বয়স বাড়াতে হবে, কংগ্রেসের এই অন্যতম দাবিতে দেশের অবস্থার কী হেরফের হবে? ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যা যত বাড়ছে চাকরি তত কমে যাচ্ছে, আরও চাকরি আদায়কে কেন্দ্র করেই যেন এখানকার রাজনীতি। সরকারের কাছে সব আবেদন বা দাবির মধ্যেই ভিক্ষের সুর।"[৬০] তাঁর আরও মনে হয়েছে, "এদেশের মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তোলাই উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। যার আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে সে কখনও অন্যায় মেনে নেয় না।"[৬১]

রবি আদি ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব ও দায়ভার গ্রহণের পর তাঁর নানা স্থানে যাতায়াত বাড়তে থেকেছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কারের ভারে জর্জরিত মুখগুলি দেখে তিনি পীড়িত হয়েছেন। দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে, বীরভূম বাঁকুড়ায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষে রবি উপলব্ধি করেছিলেন দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট ওই মানুষদের জন্য সমবেদনা মূলক কবিতা রচনাই যথেষ্ট নয়। আগে মানুষগুলোকে বাঁচানো দরকার। রবি চাঁদা তোলার জন্য তৎপর হয়েছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে সাহায্য পাঠানো ওদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রবি আরও খানিকটা এগিয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের নতুন জমিদারি হয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলে। রবি প্রস্তাব করেছিল, খরা অঞ্চলের চাষিদের সুন্দরবনের আবাদি জমিতে বিনা পয়সায় তিনি বসাতে চায়। তাদের বাড়িঘর নির্মাণ ও কৃষির সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। রবি ভাবলেন, "বাঙালিদের এমনই অদ্ভুত স্বভাব, তারা নিজের বাড়িতে না খেয়ে মরবে , তবুও দূরে কোথাও যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চায় না। বিপদ দমন করার ঝুঁকির বদলে নিশ্চেষ্ট মৃত্যুতেও তারা রাজি।"[৬২] দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে রবি এই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, ক্ষুধা কি সাংঘাতিক জিনিস। অন্যান্য অনেক বিপদ মানুষের মনুষ্যত্ব জাগিয়ে রাখে। কিন্তু খিদেয় মনুষ্যত্বও দূর হয়ে যায়। খিদের সময় মানুষ যেন অত্যন্ত একটা ক্ষুদ্র প্রাণী, প্রায় পিঁপড়ের মতন। একমুষ্টি অন্নের জন্য মানুষ হন্যে হয়ে থাকে, সমস্ত মহৎ আশা, আদর্শ ধরাশায়ী হয়ে যায়, মানুষ তখন এমন দীন। রবি আরও একটা বিষয় বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা হল, শহরের কত অন্ন উদ্বৃত্ত হয়। বিয়ে, অন্নপ্রশান ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কত অপচয় হয় তার ঠিক নেই, রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় বাসি ভাত, লুচি, মাংস; তখন ক্ষুধিত মানুষগুলির কথা এই সব শহরবাসী মনে পড়ে না। আবার এইসব লোকেরাই রাজনীতি করতে গিয়েই জ্বালাময়ী বক্তা, দেশের মানুষের দুঃখে কেঁদে উঠে বুক ভাসায়।

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের আইডল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী জাহাজ ব্যবসার চিত্রর মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে জেগে উঠতে থাকা জাতীয়তাবোধও অন্যদিকে বিদেশী ফ্লোটিলা কোম্পানি সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার বিবরণের মধ্য দিয়ে সময়ের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। উনিশ শতকের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে বাঙালী জেগেছে জাতীয়তার মন্ত্রে কিন্তু সেই মন্ত্র আপামর বাঙালীর চিন্তা চেতনায় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। বিদেশী ধনী কোম্পানির সঙ্গে অসম লড়াইতে পারেনি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে। রবিজীবনীর পাতা ওলটালে এই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্য সহজে সন্ধান করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৬ সালের ১লা মে রাজনারায়ণ বসুকে '২৫২ সার্কুলার রোড' থেকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, তাঁর সাংসারিক অবস্থা শোচনীয়। তিনি জাহাজ চালানি কারবারে প্রবৃত্ত ছিলেন। ইংরাজ কোম্পানির সঙ্গে ভয়ানক প্রতিযোগিতা চলেছিল, সেই কারবারে তিনি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, ঋণজালে একেবারে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। যে টাকা মাসোহারা পেতেন তার সমস্তই সুদ দিতে ব্যয় হয়ে যাত। তাঁর নিজের নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ অতিকষ্টে নির্বাহ হত। 'প্রথম আলো'র প্রথম পর্বশেষ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন মৃণালিনীর সন্তানসম্ভবা হবার খবর।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত জমিদার, শিলাইদহ সাজাদপুরে বজরা চেপে জমিদারি পরিদর্শনে রত। তিন সন্তানের পিতা। সংসার জীবনে সুখী স্ত্রী মৃণালিনীকে নিয়ে, কিন্তু মৃণালিনী তার মর্ম সঙ্গিনী হতে পারেনি কিছুতেই। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর কন্যা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তৈরী হয়েছে তাঁর আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা। 'রবিকা'র ছায়াতেই বেড়ে উঠেছে ইন্দিরা। অন্যদিকে স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথের কন্যা সরলা ইন্দিরার সমবয়েসী হয়েও অনেক বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিয়ে না করে কুমারী থেকে সে দেশের সেবা করতে চায়। এই সময়েই শিলাইদহ সাজাদপুর ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ চিনেছেন হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষের জীবন।

শিলাইদহে চিনেছেন অছিমুদ্দি সর্দার নামে এক কবিয়ালকে, চিনেছেন শিলাইদহ পোষ্ট অফিসের ডাক পিওন গগন হরকরাকে। সাজাদপুরে তাঁকে জমিদার হিসেবে হতে হয়েছে 'পুণ্যাহ অনুষ্ঠান' -এর অঙ্গ। এই অনুষ্ঠানে তিনি জাতিভেদ প্রথা না মেনে সকলের সঙ্গে একাসনে বসেছেন, মানবতাবাদের মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন প্রজাদের মধ্যে।

জানকীনাথ ঘোষালের বাড়িকে কেন্দ্র করেও এসেছে নবযুগ। সরলা দেবী সেই সময়ে দাঁড়িয়ে নারী হয়েও পড়েছেন পদার্থবিদ্যা। বেথুন কলেজে পড়ানো হত না পদার্থবিদ্যা। মহেন্দ্রলাল সরকারের 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর দা কাল্টিভেশান সায়েন্স' -এর সান্ধ্য লেকচার শুনে পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে পাশ করে রুপোর মেডেল পেয়েছিলেন তিনি। বিয়ে না করে দেশের কাজে যোগ দিতে চেয়েছিলেন, তার মনে হয়েছিল জীবন অনেক বড় কাজ করার জন্য, সংসার আর সন্তান পালন জীবনের ধর্ম নয়। 'ভারতী' পত্রিকার দায়ভারও তিনি তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। এই সময়েই সরলা পরিচিত হয়েছেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে। এই বাল গঙ্গাধর তিলক একদিকে গোঁড়া প্রাচীনপন্থী অন্যদিকে প্রবল দেশ প্রেমিক। তাঁর রাজনীতি চেতনা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। বাঙালী তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তার মতের মিল হয়নি। তিনি সারা দেশে একযোগে হিন্দুদের জন্য গণেশ উৎসব বা শিবাজী উৎসবের সূচনা করতে চেয়েছিলেন।

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সম্পর্কে ভেবেছেন, "যাতে আত্মবমাননা করা হয়, তাতেই তো যথার্থ জাত যায়! ...আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভাঙা কুটিরের, সবচেয়ে মলিন চাষীকেও আমি আপনার লোক বলতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিটফাট কাপড় পরে ডগকার্ট হাঁকায়, আর আমাদের নিগার বলে তারা যতই সভ্য, যতই উন্নত হোক – আমি যদি কখনও তাদের কাছাকাছি যাবার জন্য লোভ করি, তা হলে যেন আমার মাথার ওপরে জুতো পড়ে।"[৬৩] কলকাতায় কংগ্রেসের

দ্বাদশ অধিবেশনের সময়ে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা বিপিনচন্দ্র পাল যখন দেবীমূর্তিকে দেশ মাতৃকার রূপ দিয়ে কংগ্রেসের আসনে প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন, তখন রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনাকে সমর্থন জানাতে পারেননি। কংগ্রেসের মঞ্চে ইংরেজির আধিক্যও রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি, ভারতের একটি সর্বজন-বোধ্য ভাষার অভাব তিনি বোধ করেছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের নাটোর কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ বক্তাদের বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রবীণ নেতৃবৃন্দ বাংলায় বক্তৃতা দিতে রাজি হননি কোনোভাবেই। তরুণদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করে শোনানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল আপামর সাধারণ মানুষকে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করা। যদিও সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষ রবীন্দ্রনাথের বাংলাও ঠিক কতটা বুঝবে তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। উপন্যাসে ডক্লু সি ব্যানার্জি রবির কাঁধ চাপড়ে বাঁকা সুরে বলেছিলেন, "বাট ডু ইউ থিঙ্ক ইয়োর চাষাজ অ্যান্ড ভুষাজ আন্ডারস্টুড ইয়োর মেল্লিফ্লুয়াস বেঙ্গলি বেটার দ্যান আওয়ার ইংলিশ?"[৬৪]

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন ও সেই কারণে গড়ে ওঠা প্রবল অর্থচিন্তা, প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরার বিবাহ, দুই কন্যার বিবাহ, মৃণালিনী দেবীর অসুস্থতা ও মৃত্যু (২৩ শে নভেম্বর ১৯০২) ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে তাঁর সাহিত্যিক সত্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাময়িক কাল সবকিছু থেকে বিযুক্ত থাকলেও আবার যুক্ত হয়েছেন কর্মযজ্ঞে। লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলে রবীন্দ্রনাথ সর্বত ভাবে তার বিরোধিতা করেছিলেন। এই সময় রচনা করেছিলেন একের পর এক দেশাত্মবোধক গান। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' হয়ে উঠেছিল মিছিলের মুখপত্র। বয়কটের ডাক সমর্থন করেছিলেন তিনি, তাঁর আশা

ছিল "ইংরেজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বর্জন করে এই জাতি আত্মশক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠুক। এমনকি সংবাদপত্রে কালো বর্ডার দিয়ে বঙ্গভঙ্গের খবর ছাপা কিংবা সভায় দর্শকদের করতালিও তিনি পছন্দ করেন না, এগুলোও বিদেশের অনুকরণ।"[৬৫] তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন অরন্ধন ও রাখি বন্ধন ব্রতের সঙ্গে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টায় এগিয়েছিলেন বহুদূর। যদিও বঙ্গভঙ্গের বর্ষপূর্তির সময়ে তিনি আর যোগ দিতে চাইলেন না। রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে কবি ও গুরুদেব হিসেবেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে সরলা দেবীকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক নারী জাগরণের স্বরূপকে বুঝিয়েছেন। "ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হয়েও সরলা মহীশূরে চাকরি করতে গিয়েছিলেন নিছক ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার স্পৃহায়। পুরুষরা লেখাপড়া শেখে জীবিকা অর্জনের জন্য। সরলাও লেখাপড়া শিখেছে, তা সে কাজে লাগাবে না কেন? মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে নিছক ঘরের বউ হয়ে থাকবে, তা হলে সে শিক্ষার প্রয়োজন কী? স্বামীরা সগর্বে, কোনও বন্ধুকে বলবে, আমার স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট, ভাল সংস্কৃত জানে, আর স্ত্রী সেই সময় অন্দরমহলে বসে কোলের সন্তানকে দুধ খাওয়াবে, এতেই রমণী জীবনের চরম সার্থকতা? মহীশূরের মহারানি গার্লস কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট-এর চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল সরলা"[৬৬] যদিও সরলার এই স্বাধীন জীবন খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কলকাতা ফিরে তিনি 'ভারতী' পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে বেশ দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। সেই সঙ্গে দেশপ্রেমেও উদ্বুদ্ধ হতে থাকেন সরলা। এই সময়ের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সরলার 'বিলেতি ঘুষি বনাম দেশি কিল'। তিনি এই রচনায় আহ্বান জানালেন ট্রেনে-স্টিমারে, পথে-ঘাটে গোরা সৈন্য বা ইংরেজ সিভিলিয়ানরা অনেক সময় ভারতীদের অপমান করে এমনকি লাথি-ঘুঁষি মারে এমনকি, কোন নারীদের অসম্মান করতেও দ্বিধান্বিত হয় না,

কোথাও কোনো ভারতীয় এমন ঘটনার প্রতিবাদ করে থাকলে তা যেন লিখে পাঠানো হয়। সরলার উদ্যোগে 'ভারতী'র পাতায় ছাপা হতে শুরু করেছিল এসব বৃত্তান্ত। সরলা দেবী উপলব্ধি করেছিলেন "অনেকেই দেশ সম্পর্কে উদাসীন, মাতৃভূমি যে বিদেশি শাসকদের অধীনে রয়েছে, সে বোধটাও যেন নেই। যে পরাধীন জাতি পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করে না, তাদের কি উদ্ধার পাবার কোনোও উপায় আছে?"[৬৭] সেই সময়ে দাঁড়িয়ে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সরলা দেবী। প্রতাপাদিত্য ও তাঁর পুত্র উদয়াদিত্যকে আদর্শ করে বাংলার যুবসমাজকে সরলা দেবী উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তলোয়ার পুজার মধ্য দিয়ে বীরত্বের বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন। ভারতের মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হত, "তাদের পোষাক কতরকম, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ... এত মানুষ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, দেশকে মাতৃভূমি হিসেবে চিনতে শেখে, মাতৃভূমিকে পরাধীনতার অপমান থেকে মুক্ত করার জন্য একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায়, তা হলে শাসক সম্প্রদায় বিচলিত হবে না? ...কল্পনায় সে দেখতে পাচ্ছে জাগ্রত ভারত।"[৬৮] পুণায় দুজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকাণ্ডের জেরে তিলককে গ্রেপ্তার করা হলে সরলা ভেবেছেন, "আমাদের দেশের ছেলেরা সত্যিকারের মুরোদ দেখিয়েছে! ইংরেজরা এবার বুঝুক, এ দেশের ছেলেরাও অস্ত্র ধরতে জানে। সরলার ধারণা তিলক নিশ্চয় আছেন এর পিছনে। তিলকের কারাবাসেও সে খুশি। ...মামলা চলুক, তাতে দেশের মানুষ আরও রাগে ফুঁসবে! আরও কয়েকটা র‍্যন্ড নিকেশ হবে!"[৬৯] যদিও চাপেকর ভাইয়েরা ও মহাদেব রাণাডে বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। সামান্য বিচারেই তাদের ফাঁসির আদেশ হয়ে গেল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই পাশ হল সিডিশান বিল। ইংরেজদের কোনো কাজের প্রতিবাদ করার পথও রইল না। এই ঘটনায় কোনো প্রতিবাদ সভাও হল না কলকাতায়। সরলা এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তার দলের সদস্যদের মনে। তাদের অস্ত্র সংগ্রহেও প্রেরণা যুগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনই সন্ত্রাসবাদের পথ পছন্দ

করেনি, এই পথ তাঁর মতে ভ্রান্ত, তবুও চারজন সচ্চরিত্র যুবক নিজের জাতির সম্মান রক্ষার্থে অবলীলায় ফাঁসির দড়ি গলায় দিতে পারে এই ভাবনাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি।

সময় সন্ধানের পথে সুনীল রবীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড় করিয়েছেন বিবেকানন্দকে। তাঁর বিবর্তনের পথে চিনতে চেয়েছেন সময়ের বিবর্তনের স্বরূপ। উপন্যাসে প্রথম যখন নরেনকে দেখা যায় তখন তিনি জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন কলেজের ছাত্র, বি.এ পাঠরত। ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত উজ্জ্বল, কুস্তি করা সবল শরীর, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা ক্রিকেট খেলায় দক্ষ, রীতিমত সুগায়ক, পাখোয়াজ-এস্রাজের মত অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে জানেন, প্রবল তার্কিক ও আড্ডাপ্রিয়। বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য চাপাচাপি শুরু হলেও নরেন রাজি হতে পারেননি, ভেবেছেন, "জীবন সম্পর্কে একটা দর্শন তৈরী করে নেবার আগেই ঝপ করে একটা বিয়ে করে সংসারী হয়ে যায় নেহাত গাড়লেরা। এ জীবন তো রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া একটা জিনিস নয়, দুর্লভ এই মানবজন্ম, এর সার্থকতার পথ অন্বেষণ করা, চিত্তবৃত্তি বিকাশের জন্য যত্নবান না হয়ে গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে পশুর সঙ্গে তফাৎ রইল কি!"[৭০] এই সময়ে নরেনের মনে জন্মেছে প্রবল সংশয়। ডেকার্তের অহংবাদ, হিউমের নাস্তিকতা, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এসব পড়েও তাঁর মনের মধ্যে রয়ে গেছে হিন্দু ঐতিহ্য, তাই উপন্যাসে বন্ধু ব্রজেনকে সে প্রশ্ন করেছে, "যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে যা বিশ্বাস করে এসেছে, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দা যে ধর্মের বিধান আর সৃষ্টিকর্তার রূপ মেনেছেন, তা কি আমরা এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারি? যদি উড়িয়ে দিই, সেই অবিশ্বাসের যে শূন্যতা, তা সহ্য করা সম্ভব?"[৭১] ব্রজেন জানিয়েছেন, "ঈশ্বর আছেন কি নেই, এ নিয়ে মাথা ব্যথা করার দরকারটাই বা কী? এই যে এত প্রার্থনা, ধ্যান, পুজো-আচ্চা, নামাজ পড়া, উপোস, মানুষের জীবনে এর কোনো প্রয়োজন আছে? এসব বাদ দিয়েও তো দিব্যি চলে যায়। অক্ষয় দত্ত মশাই অঙ্ক দিয়ে কী

প্রমাণ করেছিলেন তুই দেখিসনি? উনি একটা ফর্মুলা দিয়েছিলেন। কৃষকরা সারাদিন পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে। তা হলে পরিশ্রম = ফসল। সেই সঙ্গে যদি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করে তাহলে পরিশ্রম + প্রার্থনা = ফসল। অর্থআআৎ প্রার্থনা = ০।"[৭২] নরেন এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল প্রবল ভূকম্প। রামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা তাঁর মনে এনে দিয়েছিল প্রবল সংশয়। রামকৃষ্ণের সম্মোহন একদিকে এনেছিন অবিশ্বাস অন্যদিকে প্রবল ভালবাসার আকর্ষণ। তিনি কোনোরকম বিধি নিষেধের জালে আবদ্ধ করতে চান না নরেনকে। "তুই যা খুশি খা, কোনও দোষ লাগবে না। শোর-গরু খেয়েও যদি কেউ ভগবানে মন রাখে তবে তা হবিষ্যান্নের তুল্য। আর শাক-পাতা খেয়েও যদি কেউ বিষয় বাসনায় ডুবে থাকে, তবে তা গরু-শোর খাওয়ার চেয়ে কোনো অংশে পবিত্র নয়।"[৭৩] এই চরম মানসিক সংকটের দিনে নরেনন্দ্রনাথকে এক ধাক্কায় বাস্তবের মাটিতে পৌঁছে দিয়েছিল তাঁর পিতার মৃত্যু। অর্থচিন্তা ও খাদ্যচিন্তার ভয়াবহতায় তাঁকে কাটাতে হয়েছিল বহু দিন ও রাত। উপন্যাসে দেখা যায়, "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ তো ছেড়েছেই নরেন্দ্র, এখন সে আর দক্ষিণেশ্বরেও যায় না। ব্রাহ্মদের সভায় দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বর কিংবা ধর্মতত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়, তা সবই এখন নরেন্দ্রর কাছে অবান্তর বলে বোধ হয়। গরিবের আবার ঈশ্বর কী? ক্ষুধার্তের কাছে ধর্মের আবার কী প্রয়োজন? ধর্মের কথায় পেট ভরে?"[৭৪] দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইলেন নরেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রতি অদ্ভুত টানে তিনি পারেননি দূরে থাকতে। রামকৃষ্ণের স্পর্শে তাঁর হয় এক ধরণের দিব্য অনুভূতি। যদিও সেই অনুভূতি কেটে যায় অচিরেই, ফিরে আসে অন্ন এবং অর্থচিন্তা। এক রাতে নরেন কালীমূর্তির কাছে আত্মসমর্পন করলেন, যদিও মূর্তিকে বিশ্বমাতা রূপে গ্রহণ করেও চাইতে পারলেন না সংসারের সচ্ছলতা।

রামকৃষ্ণের অসুস্থতার সময়ে তাঁকে ভক্তরা কাশীপুরে একটি বাগান বাড়ি ভাড়া করে রাখলে নরেন তাঁর টানে মায়ের অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। আইন পরীক্ষার জন্য বইপত্র সঙ্গে থাকলেও পড়ায় মন বসে না। একদিকে সাংসারিক দায়বদ্ধতা অন্যদিকে বৈরাগ্যের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় দগ্ধ হতে থাকেন নরেন। রামকৃষ্ণের তুলে দেওয়া গেরুয়া বস্ত্র পরে ধনী ভক্তদের অর্থ সাহায্য নেওয়া বন্ধ করে তারা গ্রহণ করেন ভিক্ষার পথ। শুধুমাত্র রামকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসায় কিছু প্রাণবান সদ্য যুবক মেতে উঠেছিলেন সন্ন্যাস ব্রতে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করতেন 'নরেন শিক্ষে দেবে'।

রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর (১৬ আগস্ট ১৮৮৬) পরই শুরু হয় তাঁদের সন্ন্যাসের মূল পথ। বরাহনগরের সেই জীর্ণ পোড়ো বাড়িতেই রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরও বহুদিন মঠ বজায় রাখছিলেন তাঁরা, কিন্তু তাতে কৃচ্ছসাধন ছাড়া সদর্থক কিছু হচ্ছিল না। ফলে দলে ভাঙন দেখা দিতে শুরু করেছিল। এক এক জন মঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছিল তীর্থযাত্রায়। নরেন ও দেশটাকে চেনার আশায় গ্রহণ করেন পরিব্রাজকের জীবন। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, শুরু হল তার পরিব্রাজক জীবন। পিছুটান নেই, সামনেও নির্দিষ্ট কোনও অভীষ্ট নেই। শুধু চলা, কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ট্রেনে। অঙ্গে গেরুয়া কৌপীন, হাতে একটি লম্বা লাঠি আর কমণ্ডলু, আর একটা পুটুলিতে খানকতক বই। পড়ার নেশা সে ছাড়তে পারে না। পড়ার ব্যাপারে তার বাছ বিচার নেই, সে যেমন বেদান্ত পড়ে কেউ ট্রেনের টিকিট কেটে দিলে ট্রেনে চাপে সেরকম কেউ না দিলে হাঁটে। কিছুর জন্য ব্যস্ততা তো নেই তার। নরেন কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির যেমন দেখতে যায়, তেমনি সে বারাণসীতে পণ্ডিতপ্রবর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তর্কে মাতে। ভক্তির জন্য সে জ্ঞানকে ছাড়েনি, আবার জ্ঞানের জন্য সে সৌন্দর্যবোধও বিসর্জন দেয়নি। এদেশে আগে

কেউ ইংরিজি বলা সাধু দেখেনি। শুধু ইংরিজি বলাই নয়, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান এবং চিন্তা ভাবনায় আধুনিক।

এভাবে পরিব্রাজক রূপে ভারত ভ্রমণের সময় তিনি উপলব্ধি করলেন প্রকৃত ভারতবর্ষকে। যাদের দুবেলা আহার জোটে না, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। দারিদ্রের এমন কুম্ভীপাক যে কেউ বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পায় না, শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, ধর্মের মর্মও বোঝে না। যে মহান ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে ভারতবাসীর গর্ব, তা অত্যন্ত নিম্নস্তরে পৌঁছেছে। তিরিশ কোটি মানুষ, তার মধ্যে শতকরা একজন মাত্র ইংরেজি শিক্ষিত। ইদানীং সে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা প্রচুর। তারা কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, আবার ইংরেজি শিখে জীবিকার সংস্থান করতে পারে না। ইংরেজ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য শোষণ, ভারতীয়দের নিজস্ব সম্পদ বলতে আর কিছু নেই। এইরকম অবস্থায় ধর্মেরও অধঃপতন হয়। জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ, যুক্তি মার্গ সব চুলোয় গেছে, এখন শুধু ছুঁৎ মার্গ। জাত পাতের হাজার বিভেদ। হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তর নেই, অন্য দেশে তারা ধর্ম প্রচার করতে যায়নি, অন্য ধর্মের মানুষদের হিন্দু ধর্মের আশ্রয়ে টেনে আনেনি কখনও, বরং নিজেদের ধর্মের মানুষদেরই জাতিচ্যুত করেছে। দেশের এই দুর্বিসহ অবস্থা দেখে নরেন ভেবেছেন, যে ধর্ম মানুষকে অপমান করে তা ধর্ম নয়, দেশের দারিদ্র দূর করা, অসহায় মানুষকে সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম। বরানগর মঠ ছাড়ার চার বছর পর নরেন সারা ভারত পরিভ্রমণ করে কন্যাকুমারীর একটা শিলাতটে বসে তার মনে পড়ল সারা দেশের ক্ষুধার্ত মানুষের মুখ। মহাসমুদ্রের দিকে পেছন ফিরে তিনি দেখলেন ভারতের মহা জনসমষ্টি, অভুক্ত, অর্দ্ধনগ্ন। এদের উদ্ধার করতে না পারলে ধর্মপ্রচার নিতান্ত অপপ্রয়াস। বিজ্ঞান ছাড়া গতি নেই। বৈজ্ঞানিক কারিগরি ও যন্ত্র নির্মাণে পশ্চিম দেশগুলো অনেক এগিয়ে আছে। কিন্তু ওদের কাছ থেকে নিতে হলে কিছু তো দিতে হবে? এই রিক্ত হীনবল ভারতের দেবার মত স্বর্ণ নেই, শস্য

নেই, শুধু আছে কিছু আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও দর্শন। পশ্চিমের মানুষ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নানান দ্বিধা সংশয় ও নৈরাশ্যে ভুগছেন। তাদের কাছে গিয়ে বলা যেতে পারে তোমরা আমাদের উদরের অন্ন দাও আমরা তোমাদের মানসিক খাদ্য দেব।

নরেন ঠিক করলেন শিকাগোতে যে বিশ্বধর্ম সম্মেলন হচ্ছে সেই মঞ্চ থেকেই নিজের চিন্তাধারা পৌঁছে দিতে হবে। নরেন আরও ঠিক করলেন ভারতের মানুষের চাঁদার টাকায় ভারতের প্রতিনিধি হয়েই তিনি যাবেন। মাদ্রাজে পৌঁছে তিনি শুভানুধ্যায়ীদের জানালেন তাঁর পরিকল্পনা। মাদ্রাজী পেরুমল আলাসিঙ্গা সহ বেশ কিছু যুবক লিপ্ত হয়েছিলেন অর্থ সংগ্রহের কাজে। যদিও বিশাল পরিমাণ অর্থ মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। দেশীয় রাজাদের কাছে সাহায্য চাইলেন নরেন। খেতড়ির রাজা অজিত সিং সবচেয়ে উদার হস্ত প্রসারিত করলেন। অজিত সিং নরেনের পোশাকের পরিকল্পনা করে দিলেন। দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশে গেলে কেউ গ্রাহ্য করবে না, পরিচ্ছেদের ঔজ্জ্বল্যে আগে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চাই। সন্ন্যাস জীবনে ব্যবহৃত অন্য সমস্ত নাম বাদ দিয়ে খেতড়ির রাজা পছন্দ করলেন বিবেকানন্দ নামটি। নরেন হয়ে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি পৌঁছলেন শিকাগো। বহু সমস্যার কন্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে যখন তিনি মঞ্চে পৌঁছলেন তাঁর সহজ অভিব্যক্তি নাড়িয়ে দিল আমেরিকার শ্রোতৃ সমাজকে। সহস্র করতালিতে কেঁপে উঠল প্রেক্ষাগৃহ, জনতার উচ্ছ্বাসে জয়ী ঘোষিত হলেন বিবেকানন্দ। আমেরিকান পত্র পত্রিকায় তাকে অভিহিত করা হল ‘সাইক্লোনিক হিন্দু’ নামে। আমেরিকার শিক্ষিত সমাজের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন প্রবল ভাবে জনপ্রিয়। শুধুমাত্র বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে নয়, আরও অনেকগুলি আলোচনা চক্রে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় এক দারুণ আকর্ষণী শক্তি আছে। যে সব সভায় অনেক বক্তা সে সব সভায় বিবেকানন্দের ডাক পড়ে সবার শেষে। অন্যান্যদের বক্তৃতা শুনতে

শুনতে শ্রোতারা ঝিমিয়ে পড়লেও বিবেকানন্দের বক্তব্য সকলকে উজ্জীবিত করে। আমেরিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

এই সময়ে শিকাগোর শ্লেটন লাইসিয়াম ব্যুরো নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাঁর সঙ্গে একটা তিন বছরের চুক্তি করে ফেলল, তারা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করবে, টিকিট বিক্রির টাকা বক্তা ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটি ছিল বিবেকানন্দের জন্য ভীষণ উপযোগী। তিনি ভারতের ধর্ম ও বাণী প্রচার করার জন্য এদেশে এসেছেন, সহসা ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না, তাঁর পক্ষে নানা শহরে ঘুরে ঘুরে ঘর ভাড়া করা, টিকিট বিক্রি করা সম্ভব নয়, সুতরাং এই ভার অন্যের ওপর চাপানোই শ্রেয়। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে কী এরকমভাবে অর্থ উপার্জন শ্রেয়? চুক্তিটি করার সময়ে তিনি আমেরিকায় তাঁর নবলব্ধ বন্ধুদের কারো সঙ্গে পরামর্শ করেননি, দেশেও কাউকে জানাননি। অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে বিবেকানন্দ একটা যুক্তি তৈরী করে নিলেন, ভারতে একজন সন্ন্যাসী গাছতলায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে কিন্তু শীতের দেশে তা সম্ভব নয়। ভারতে সাধু সন্ন্যাসী দেখলে পুণ্য অর্জনের আশায় মানুষ তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়। এদেশেও তিনি অনেকেরই আতিথ্য পেয়েছেন, কিন্তু মাঝেমধ্যে তাকে হোটেলেও থাকতে হয়েছে, তাছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত কিছু খরচ রয়েছে। তাছাড়া অনেক টাকা জমিয়ে সে টাকা তিনি দেশে পাঠাবেন, দেশে শিল্প স্থাপন করতে না পারলে দেশের দরিদ্রদশা কোনোদিনও ঘুচবে না।

বহু শহরে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে তিনি প্রচার করতে লাগলেন হিন্দু ধর্মের ও ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শের মহত্ব। দেশের নানা কুসংস্কারের প্রসঙ্গ তুলে ভারতবর্ষকে কালিমালিপ্ত করলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশে ধর্মান্ধতা আছে, কুসংস্কার আছে। আমরা যখন ধর্মান্ধ হই, আমরা জগন্নাথ দেবের

বিরাট রথের চাকার সামনে লাফিয়ে পড়ে নিজেই নিষ্পেষিত হই, নিজেদের গলায় ছুরি দিই কিংবা কন্টকশয্যায় শুই। কিন্তু তোমরা যখন ধর্মান্ধ হও, তখন তোমরা অন্যের গলায় ছুড়ি চালাও, অন্যদের আগুনে পোড়াও, তাদের জন্য কন্টকশয্যা তৈরী করো, নিজেদের চামড়া তোমরা নিজেদের সাবধানে বাঁচিয়ে চলো।''[৭৫] চার মাস মতো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থেকে তারপর বহু অর্থের বিনিময়ে তিনি এই চুক্তি থেকে মুক্তি পেলেন। আমেরিকায় তিনি বহু ধনীর বাড়িতে বাস করে বক্তৃতার আয়োজন করে তিনি নিজের কথা পৌঁছতে লাগলেন সকলের কাছে। এ দেশের নারীদের স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন বিবেকানন্দ। গোড়া থেকে নারীদের সংখ্যাই বেশি। এঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর মা কিংবা বোনের মতন সম্পর্ক। তবে খ্রিস্টান মিশনারিরা বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা দেখে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে নানা কুৎসা রটাতে শুরু করেছিল। বিবেকানন্দের বক্তৃতায় তাদের জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছিল। তাঁর বক্তৃতা শুনে অনেকেরই ধারণা হচ্ছিল যে দেশে এমন উচ্চ ধর্মীয় ভাব আছে সে দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য মিশনারি পাঠাবার কী দরকার। খ্রিস্টান মিশনারিদের আয় কমে যেতে লাগল। আর বিবেকানন্দ ঘুরে ঘুরে ডলার পকেটস্থ করতে লাগল। একজন সন্ন্যাসীকে বাতিল করার সবচেয়ে বড় উপায় হল তাঁর চরিত্র হনন করা, পাদ্রিরা বিভিন্ন পরিবারে বেনামী চিঠি পাঠাতে লাগলেন, দুশ্চরিত্র বিবেকানন্দকে যেন কোনো বাড়িতে স্থান দেওয়া না হয়। শিকাগোয় তিনি প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন লায়ন পরিবারে। তবে তাঁর সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল হেল পরিবারের সঙ্গে। বস্টনের কাছে কেমব্রিজে থাকেন শ্রীমতি অলি বুল। তিনি একজন ধনী বিধবা। কেমব্রিজের জ্ঞানী-গুণী-বুদ্ধিজীবী মহলে এই প্রৌঢ়ার বিশেষ স্থান আছে। প্রায়ই তাঁর বাড়িতে নানা বিদ্বজ্জনের সমাবেশ ঘটে, খানাপিনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাঙ্গের আলোচনা হয়, শ্রীমতি ওলি বুল এখানে ইউরোপীয় প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। ইউরোপের সমাজে নারীরা শুধু সংসারের তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকেন না, তাঁরা কবি

শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষক হন। এই অলি বুলের বৈঠকখানায় বিবেকানন্দ কয়েকবার বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবন দর্শনে সকলে মুগ্ধ হয়ে যান। বেসী স্টার্জেস ও জোসেফিন ম্যাকাউল দুই বোন। বেসীর ডাকনাম বেটি আর জোসেফিনের ডাকনাম জো, আমেরিকান সমাজের ওপর মহলে এই দুই বোনের খুব সমাদর, এরা দুজনেই কিছুদিন ফ্রান্সে কাটিয়ে এসেছে, প্যারিসের শিল্পী, লেখক, অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংস্পর্শে এদের সাংস্কৃতিক রুচি উন্নত হয়েছিল। আমেরিকানরা ফরাসী সংস্কৃতি ও আদব-কায়দাকে বেশ সমীহ করে, সুতরাং তাদের চোখে এই দুই বোন অন্যদের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয়। বেটি আর জো নিয়মিত ছবির প্রদর্শনী দেখে, কনসার্ট বা থিয়েটার বাদ দেয় না, বিখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তৃতা শুনতে যায়। বিবেকানন্দের বক্তৃতা এই দুই বোনকে মোহাবিষ্ট করেছিল। বিবেকানন্দের ভাষণের প্রতিটি শব্দ তারা মনে গেঁথে নিতে চায়, নিজের খরচে তারা নিয়োগ করল একজন শ্রেষ্ঠ স্টেনোগ্রাফার, যিনি প্রতি মিনিটে দুশো শব্দ লিখতে পারে।

আমেরিকায় বহু গুণীজনের কাছে আদর পেয়েও তিনি দেশের মানুষের সার্বিক উন্নতির পথকে প্রশস্ত করার চিন্তা ত্যাগ করেননি। ভেবেছেন, "আমার স্থান এখানে নয়, স্বদেশে। দুঃখী, বঞ্চিত মানুষগুলোকে জাগাতে হবে, তারা মানুষ হিসেবে নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার দাবী করবে।"[৭৬] অন্যতমা অনুরক্তা জো ম্যাকাউলের সঙ্গে তিনি পৌঁছেছিলেন ইউরোপ। সেখানে তিনি অনুভব করলেন, "আমেরিকার তুলনায় ইউরোপে বর্ণবিদ্বেষ কম। একা একা রাস্তায় ঘুরলেও ফেউ এর মত একপাল ছেলেমেয়ে ব্ল্যাকি ব্ল্যাকি বলে তাড়া করে না। আমেরিকায় ছোটো কিংবা মাঝারি হোটেলে কালো চামড়ার লোকেদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, এমনকি নাপিতের দোকানেও চুল কাটতে প্রত্যাখ্যান করে, ইংল্যান্ডে সে সব সমস্যা নেই। স্বামীজির বক্তৃতায় যেসব নারী পুরুষ আসে, তারা ধৈর্যশীল শ্রোতা, যে কোনো বিষয়ই তারা গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা

করে, সেই তুলনায় আমেরিকানরা ছটফটে। অধিকাংশ আমেরিকানই কূপমণ্ডূক, ইংরেজরা পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। এসব দেখে স্বামীজির মনে হয়, ভারত শাসনের জন্য যেসব ইংরেজদের পাঠানো হয়, তারা বেশির ভাগই ছ্যাঁচড়া ধরনের। তারা ইংরেজ জাতির কুলাঙ্গার।"[৭৭]

দীর্ঘ সময় আমেরিকাতে কাটানোর ফলে এমন কয়েকজন লোককে বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন যাঁরা বেদান্তের মানবধর্ম প্রচারের কাজ করতে চেয়েছিলেন। আমেরিকার সহস্রদ্বীপে থাকার সময়, স্বামীজি তাঁর ভক্তদের দীক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, ল্যান্ডসবার্গ ও মেরি লুই হলেন কৃপানন্দ ও অভয়ানন্দ। আমেরিকান নারী পুরুষরা নিজেদের নাম বর্জন করে ভারতীয় নাম গ্রহণ করতে লাগলেন। লন্ডনে এসেও তিনি মন দিলেন তাঁর আদর্শ প্রচারে। শ্রীমতি মুলার এবং শ্রীযুক্ত স্টার্ডির উৎসাহে বক্তৃতাস্থানের ব্যবস্থা হয়ে গেল,প্রথম থেকেই উৎসাহী লোক আসতে থাকল দলে দলে। সংবাদপত্র গুলোও মনোযোগ দিল তাঁর দিকে। ক্রমে দিনে দুবার বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। তাঁর বক্তৃতায় যেমন থাকে ইতিহাস শাস্ত্র, দর্শন, যেমন থাকে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাও তেমন বাদ যায় না। আমেরিকায় যেমন তিনি আমেরিকানদের ধনতান্ত্রিক উন্মত্ততার কথা বলতে ছাড়েননি, এখানেও তেমনি ইংরেজদের যুদ্ধনীতি ও শাসনের উন্মত্ততার কথা বলতে পিছপা হননি। এখানেই বিবেকানন্দের প্রতি মুগ্ধ হলেন তাঁর অন্যতমা অনুগামিনী মার্গারেট নোবেল। স্বামীজির ত্যাগের আদর্শে তিনি হয়ে উঠলেন মুগ্ধ। তাঁর আহ্বানে সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেও তিনি দ্বিধা করলেন না।

এক বস্ত্রে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় প্রায় কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি রওনা দিয়েছিলেন, চার বছর পর ফিরে এলেন রাজকীয় মহিমায়। ভারতে ফিরে তিনি পেতে শুরু করলেন বিপুল সংবর্ধনা যখন ইংল্যান্ডে বক্তৃতা সভাগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল বেশ কয়েকজন সক্রিয় শিষ্য ও কর্মী পাওয়া গেছিল তারই মধ্যে একদিন তিনি ঠিক করলেন দেশে ফিরে আসবেন। বিদেশে যতই সাফল্য আসুক দেশে তাঁর গুরুভাইরা অনেকটা

দিশেহারা অবস্থার মধ্যে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের নামে তারা সংসার ছেড়েছে, তাদের সকলকে এক নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে এনে একটি সঙ্ঘ বা মিশন স্থাপন করতে হবে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সেবামূলক কাজে। এতকাল হিন্দুধর্ম শিখিয়েছে শুধু ব্যক্তি মানুষের মুক্তির কথা। চতুর্দিকে এত অভাব, এত দারিদ্র, এত বঞ্চনা, এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে যদি নির্জনে একা তপস্যা করো, তা স্বার্থপরতারই নামান্তর, অন্য সব ধর্মে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানবসেবার উদ্যোগ থাকে, হিন্দুধর্মে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনো কাজ করার ধারণাই নেই, সেই কারণেই হিন্দুধর্মের এত অবনতি। কোনো হিন্দু সন্ন্যাসী সচরাচর যে কথা বলেন না, বিবেকানন্দ উচ্চারণ করলেন সে সার সত্য। মুর্তিপূজা প্রকৃত পূজা নয়। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী এদের মধ্যে যিনি শিবের দর্শন করেন তিনিই যথার্থ শিবোপাসনা করেন। শিবের সন্তানদের সেবাই প্রকৃত শিবসেবা, যে ব্যক্তি প্রতিমার মধ্যে শিবপাসনা করে সে প্রবর্তক মাত্র। তিনি উচ্চারণ করলেন এমন কিছু শব্দ যা কোনো সন্ন্যাসীর পক্ষে বলা প্রায় অসম্ভব। মাদ্রাজের শেষ বক্তৃতায় বললেন, এখন পুজো-টুজো সব বন্ধ থাক। আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য হোন, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কটা বছর ভুলে থাকলে ক্ষতি নেই, সেই সব দেবতারা এখন ঘুমাচ্ছে, দেশের মানুষই জাগ্রত দেবতা। দেশের ভয়াবহ দুরবস্থায় তিনি ধর্মের কথা উচ্চারণ করে মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন, দেশের মানুষকে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে। ভক্তির বদলে যুক্তির যুগ এসেছে।

ইউরোপ আমেরিকায় দীর্ঘসময় কাটিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, যারা খুব ধনী তাদেরও অভাব থাকে, আহার বিহারে কোনো অভাব না থাকলেও তারা মানসিক দিক থেকে বুভুক্ষু। তাই তিনি চেয়েছিলেন আদান প্রদানের সম্পর্ক। বলেছিলেন, "ওদের কাছ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা আমাদের নিতেই হবে, তার বদলে আমরাও দেব এক

উদার ধর্ম দর্শন, যাতে শান্তির সন্ধান পাওয়া যাবে।”[৭৮] হিন্দু সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সগর্বে উচ্চারণ করেছিলেন, আগে মানুষকে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর ধর্ম। “দারিদ্রই সব রোগের মূল। দারিদ্র মানুষকে একেবারে নির্জীব, কাপুরুষ করে দেয়। আমার গুরু বলতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। আমিও মনে করি, এমনকী এ দেশের একটা কুকুরও যতদিন অভুক্ত থাকবে ততদিন বেদ-পুরান-কোরান-বাইবেল চর্চার কোনো প্রয়োজন নেই। দেশবাসীর অন্ন জোগানোর ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো ধর্মেরও প্রয়োজন নেই।”[৭৯] শেষ পর্যন্ত তিনি মানবজাতিকে এমন জায়াগায় নিয়ে যেতে চান, যেখানে বেদ নেই, বাইবেল নেই, কোরানও নেই। তিনি ভেবেছিলেন শূদ্র জাগরণের কথা। যারা জাতির মেরুদণ্ড, তারাই কিনা জাত, পতিত, অচ্ছুৎ। এদের উন্নতি ঘটাতে না পারলে গীতা, বেদ, বেদান্ত সব মিথ্যে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে বিরাট কর্মযজ্ঞে যোগদান করার পর নিবেদিতা এলেন তাঁর অনুগামী হয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞে। তিনি নানা বাধা সত্ত্বেও এদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে তিনি নিজেকে করলেন নিয়োজিত। প্রথমে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বামীজির দূতি হিসাবে মানুষের সেবা করবেন এবং ভারতবাসীদের শিক্ষিত করে তোলার ব্রত নিয়েই তিনি এগিয়ে যাবেন, কিন্তু যত তিনি মানুষের সঙ্গে মিশতে লাগলেন, তত উপলব্ধি করলেন এদেশের কোটি কোটি মানুষের মুখে লেখা আছে পরাধীনতার জ্বালা, বেদনা, অপমান। এ দেশের দারিদ্র অশিক্ষা ইত্যাদির মূলে আছে পরাধীনতা। একটা স্কুল খুলে পনেরো কুড়িটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে কিংবা রোগ মহামারীর সময়ে দুচারটে বস্তিতে সেবাকর্ম চালিয়ে সেই মূল সমস্যার গায়ে একটি আঁচড়ও কাটা যাবে না। বিদেশি শাসকদের দূর করে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনই এখন প্রধান কাজ। বিবেকানন্দের অনুগামী হিসেবে নিবেদিতা কালীর মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, কালী দ্য মাদার নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তিনি

অনুভব করলেন, এখন তাঁর নতুন বই লেখা উচিত, যে বইয়ের নাম হবে ‘স্বাধীনতা’। তিনি অনুভব করলেন, স্বাধীনতার রূপ যে কী তা অধিকাংশ ভারতবাসী জানে না, বহু বছর ধরে পরাধীনতার অপমান সইতে সইতে স্বাধীনতার স্বাদ তারা ভুলে গেছে। ইংরেজরা যেন দেবতাদের মত অপরাজেয়। তাদের বিতাড়ন করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না বরং আবেদন নিবেদন ভিক্ষা চেয়ে কিছু সুযোগ সুবিধে আদায়ের চেষ্টা করাই তাদের কাছে শ্রেয়। পরাধীনতার জ্বালা এবং শোষিত নিষ্পেষিত ভারতীয় জনগণের অবস্থা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ সচেতন। প্রথম প্রথম ভারতে এসে নিবেদিতা সব কিছু দেখেই মুগ্ধ হতেন, ভারতে চুরি ডাকাতি নরহত্যার সংখ্যা খুব কম দেখে নিবেদিতা একদিন সব কিছু দেখেই মুগ্ধ হতেন, ভারতীয়রা শান্তিপূর্ণজাতি। তা শুনে স্বামীজী বলেছিলেন, এই জাতটা এমনি নির্জীব হয়ে গেছে যে ভালো করে গুণ্ডামি ডাকাতি করতেও জানে না। তিনি আরও বলেছেন, ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজদের পক্ষে এত সহজ হয়েছিল কারণ তারা ছিল সঙ্ঘবদ্ধ জাতি, নিবেদিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন নিপীড়িত জাতিকে জাগিয়ে তুলতে তিনি নিজের অগ্নিশ্রাবী ভাষণকে কাজে লাগাবেন, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর মতে জগতের সেবা, অন্নদান, বিদ্যাদান, জ্ঞানদান বেলুড় মঠ স্থাপনের এগুলিই প্রধান উদ্দেশ্য। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন, ভারত স্বাধীন না হলে এদেশের সুসন্তানেরাও বিশ্বের দরবারে যোগ্য মর্যাদা পাবে না। ধর্ম বিপ্লবের বদলে রাজনৈতিক বিপ্লবের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। এই সময়ে তিনি স্বামীজীর অন্য শিষ্যা জো ম্যাকাউলের কাছে জাপানের দূত অকাকুরার সন্ধান পেলেন। ওকাকুরার সঙ্গে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁর কাছে খুলে গেল নতুন দিগন্ত। ওকাকুরা শুধু পণ্ডিত নয়, তিনি স্বাধীনতার প্রবক্তা। একটি অশ্রুতপূর্ব তত্ত্ব এনেছেন তিনি, এশিয়া মহাদেশের ঐক্য। এশিয়ার সব দেশগুলি মিলে ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। জাপান কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি ভারতকে সহযোগী দেশ হিসেবে পেতে চায়। ভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম

শুরু করলেই অইসব দেশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। ওকাকুরা সেই বার্তা নিয়েই ভারতে এসেছেন। কলকাতায় ওকাকুরার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর নিবেদিতা ওকাকুরার সহযোগী হয়ে গেলেন প্রথম দর্শনেই। যদিও আমৃত্যু স্বামীজী নিবেদিতার স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াকে মেনে নিতে পারেননি।

'প্রথম আলো' উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পেরিয়ে বাঙালীর আত্মানুসন্ধানের ইতিবৃত্ত। সময় সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় বিবর্তনের পথে, আর এই বিবর্তন ঘটায় উদ্বর্তন। সেখানে নিজের সত্তার সঙ্গে লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে চরিত্রগুলি, বিবর্তনের পথে তারা হয়েছে উদ্বর্তিত। শিক্ষা বোধকে জাগ্রত করে, এই জাগ্রত বোধ আলো খুঁজতে চেয়েছে, নতুন আলো সরিয়ে দিয়েছে পুরোনো অন্ধকারকে। 'প্রথম আলো' এই আলোকিত সত্তার সার্বিকভাবে জেগে ওঠার ইতিবৃত্ত। আত্ম অনুসন্ধানের পথে বিবর্তিত চরিত্রগুলি বিশ শতকের প্রথম দশকে আবিষ্কার করেছে পরাধীনতার গ্লানি। আত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজে নেওয়ার লড়াই তাদের এগিয়ে দিয়েছে উদ্বর্তনের পথে।

তথ্যসূত্রঃ

১। লেখকের কথা, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২। পৃ ১১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩। পৃ ১২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৪। পৃ ১৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫। পৃ ১৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬। পৃ ১৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭। পৃ ১৭, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৮। পৃ ১১৫, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৯। পৃ ৬২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১০। পৃ ২৫, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১১। পৃ ২৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১২। পৃ ৩০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৩। পৃ ৬৫, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৪। পৃ ৬৬, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৫। পৃ ৬৭, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৬। পৃ ৬৭ , প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৭। পৃ ১২৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৮। পৃ ১৩১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৯। পৃ ১৩১, ১৩২ প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২০। পৃ ১৩২ প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২১। পৃ ১৩৩ প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২২। পৃ ১৬৭ প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৩। পৃ ২০৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৪। পৃ ২১২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৫। পৃ ৩৪১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৬। পৃ ৬০১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৭। পৃ ৬০৩ , প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৮। পৃ ৪১৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৯। পৃ ৪৭২, ৪৭৩ , প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩০। পৃ ৭০১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩১। পৃ ৮৪৯,প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩২। পৃ ৮৬২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৩। পৃ ৯২১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৪। পৃ ৯৭৮, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৫। পৃ ১০০০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৬। পৃ ১০৩৩, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৭। পৃ ১১১১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৮। পৃ ৭২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৯। পৃ ৭২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৪০। পৃ ১০০, রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯

৪১। পৃ ৭৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৪২। পৃ ১১৮, রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯

৪৩। পৃ ৮০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৪৪। পৃ ৩৭৬, ৩৭৭ জুতা-ব্যবস্থা (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত), ভারতী জৈষ্ঠ ১২৮৮, সমাজ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পুণর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা

৪৫। পৃ ১৩৭, রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯

৪৬। পৃ ১৪৬, রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯

৪৭। পৃ ১৩০, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাদ্র ১৮১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

৪৮। পৃ ১৩৬, জীবনস্মৃতি, , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাদ্র ১৮১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

৪৯। পৃ ১৪৯, রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯

৫০। পৃ ১৩৬, ১৩৭ জীবনস্মৃতি, , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাদ্র ১৮১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

৫১। পৃ ২৪, ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৫২। পৃ ২১, ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৫৩। পৃ ৭৭, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫৪। পৃ ৭৭, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫৫। পৃ ৭৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫৬। পৃ ৭৮, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫৭। পৃ ৪০৩, ন্যাশনাল ফান্ড, ভারতী ১২৯০, সমাজ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পুণর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা

৫৮। পৃ ২৬৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫৯। পৃ ২৬৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬০। পৃ ৩৪৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬১। পৃ ৩৫০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬২। পৃ ৩৫০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৩। পৃ ৫২৮, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৪। পৃ ৬৭৬, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৫। পৃ ১০০৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৬। পৃ ৬৬২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৭। পৃ ৬৬৫, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৮। পৃ ৬৬৮, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৯। পৃ ৬৮২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭০। পৃ ১৩৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭১। পৃ ১৩৬, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭২। পৃ ১৩৬, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৩। পৃ ২০০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৪। পৃ ২৫০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৫। পৃ ৫৫৩, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৬। পৃ ৫৬১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৭। পৃ ৬১৩, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৮। পৃ ৬৩৬, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৯। পৃ ৭৭৭, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা